লাল টুকটুকে দিন

লাল টুকটুকে দিন

আজিজুল হক

আশীর্বাদ
প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

অন্ধকার রাতের পর প্রভাতের সূর্যের রঙ-ও লাল! আবার দিনের শেষের ডুবন্ত সূর্যটাও ডুবে যায় লাল রঙ ছড়িয়েই! কোথায় যায় সেই লাল রঙ!

সেই 'লাল রঙ' ডুবন্ত সূর্যটা জমা করে যায় নতুন দিনের সূর্যের কাছে। এমনি করে-ই প্রতিটি দিন আর-ও 'লাল' হয়ে ওঠে! যা হারায়, সেটা আরও ভালভাবে ফিরে আসে।

বিশ্বাসী সেই নতুন বছরের সূর্যদেরই দিলাম।

লাল টুকটুকে দিন

তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ—
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল।
  ফিরে দেখি সে আগন্তুক
ঘর আলো করে বসে আছে পিলসুজে!

দিনে দূরে ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে।
ঠা-ঠা রোদ্দুরে পাইনি কোথাও ছায়া,
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে
চোখ মুছি—
  তুমি স্বপ্ন!
    না, তুমি মায়া?
আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি—
গলুক
  বুকের
  অশ্রুজমাট শিলা।
দাও তুমি ভালবাসাকে জন্মভূমি
ঘৃণার ধনুকে
    আমি টেনে বাঁধি
      ছিলা।

সারাদিন গেল।
  কেন দিলে নাকো দেখা—
ফুৎকারে দিক্‌পৃথিবী আঁধার করে?
বুঝি সেই রাগে
    ঝঞ্ঝায় একা একা
এখনও বজ্র আকাশকে ছেঁড়ে খোঁড়ে?
দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের
    ঘোড়ায় চাপায় জিন,
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
    লাল টুকটুকে দিন।'

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুভাষদা নিশ্চয়, ভূমিকা হিসাবে এটা না-জিগ্যেস করে ব্যবহার করার জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন না! করলে-ও ক্ষতিপূরণ দোবো না। কারণ, পুরনো সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের হাতিয়ার—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নয়!

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূত্রপাত এবং সূত্রধর

এই বইটা সম্পর্কে দু-চারটে পাতা খরচ করতেই হচ্ছে। ব্যাপারটা 'প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো' বলেও অনেকে ভাবতে পারেন।

লেখাটা শারদীয়া 'আজকাল'-এ (১৯৯৯) 'লালটুকটুকে দিন' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার মত লেখককুলে জোর করে ঢুকে পড়া লোকদের লেখা যেমন ভাবে প্রকাশ হয়—সেই রকম ভাবেই। ছাপার কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা যখন সম্পাদক-কুলের ব্লাড-সুগার বাড়িয়ে দিচ্ছে, বাজার-চলতি লেখকদের উপন্যাস, গল্পতেই শারদ-সংখ্যাগুলোর সব কাগজ খেয়ে ফেলছে, তখন আমাদের জন্য 'কোটা' কোথায়?

এই রকম পরিস্থিতিতে দুঃসাহসী অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী 'আজকাল' সম্পাদক অশোক আমন্ত্রণ জানালেন লেখার জন্য। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা সংখ্যার মধ্যে একটা ভিন্ন স্বাদের লেখা চাই। লেখাটাকে হতে হবে গভীরতায় ছোটগল্প, ব্যাপ্তিতে উপন্যাস! অনেকদিন আগের পড়ে থাকা একটা বিশাল লেখাকে কেটে-ছেঁটে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। লেখাটার নামকরণও তাঁর। বেশ মানানসই নাম। যদিও আমার দেওয়া নাম ছিল "নান্যপন্থাঃ"।

আমার সব লেখার কপালে যা-জুটে থাকে, প্রকাশ হবার পরে এর কপালেও তাই জুটেছে। অনুজদের সমর্থন, সমবয়স্কদের তীব্র কষাঘাত, আর অগ্রজ বিদগ্ধদের সস্নেহ-সমালোচনা এবং উৎসাহ। ঠিক এই কারণেই এখনও আমি কলমটা ছুঁড়ে ফেলতে পারছি না। কষাঘাত জিদ বাড়িয়ে দেয়, সমর্থন দেয় প্রেরণা; সেদিক দিয়ে বলতে গেলে আমি সৌভাগ্যবান। আমি যেন সেই বোলার—ব্যাটধারীকে যে খেলতে বাধ্য করাবেই। পাঠক নিস্পৃহ থাকতে পারেন না, মতামত তাঁকে দিতেই হবে। ক'জন লেখকের

কপালে এটা জোটে? তাই আমার পাঠকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ!

প্রকাশ হবার পর বহু মানুষ অজস্র চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। কেউ বলেছেন—"এ কী ফর্‌ম! এটা তো এখনও সাহিত্য আন্দোলনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে!" কপাল! শেষ পর্যন্ত আমার কপালেও "ফর্‌ম"? চিরকাল 'কনটেন্ট' নিয়ে কাজ করে, এখন শুনতে হবে লেখাটা ভাল 'ফর্‌মে'র জন্য!

সমবয়স্ক প্রতিষ্ঠিত সমালোচক-লেখকরা বললেন—'এ কী হঠাৎ 'স্যুররিয়েলিজমের' খপ্পরে পড়লে কেন? হতাশা!'

'রক্ষে করুন দাদারা! বস্তুটার বানান-ই আমি জানি না অর্থ বোঝা তো পরের কথা! আমি ভয়ংকর রকমের আশাবাদী তাই হতাশা থাকতেই পারে। যিনি আশা-ই করেন না তাঁর আবার আশা-হতাশা! সবচেয়ে বড় কথা, রিয়েলিজমের (বাস্তবতার) আসুরিকরণের নাম-ই তো স্যুররিয়েলিজম! ওসবের মধ্যে আমি নেই!

অনুরাগী পাঠকরা বার বার জানতে চেয়েছেন—এটা কি আত্ম-জৈবনিক? এঁরাই ফেলেছেন সবচেয়ে মুশকিলে। এরা সৎ-পাঠক। কিন্তু লেখার 'মেকানিজম' জানেন না। প্রতিটি লেখকেরই প্রতিটি লেখা 'আত্ম'কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সারাজীবন ধরে একজন লেখক তো একটা লেখাই লিখে যান। লেখা মাত্রই বাস্তব চরিত্রের প্রতিচ্ছবি তা সেটা "পারভার্টেড্" (বিকৃত)-ই হোক, "ইনভার্টেড"-ই হোক অথবা "এক্সটেন্ডেডই" হোক। বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হতে সেটা বাধ্য কিন্তু কখনই সেটা 'রিয়েল-মিরর-ইমেজ' নয়। এর-ই জন্য যখন কোন লেখক পিঠের চামড়া বাঁচানোর জন্য কিংবা আইনের অথবা বাজার হারাবার ভয়ে বলেন—"সব চরিত্রই কাল্পনিক, কারুর সঙ্গে যদি কোন সাদৃশ এসে যায় সেটা কাকতালীয়!"—তখন সেটা ডাহা মিথ্যা কথা। তিনি লেখার 'মেকানিজ্‌ম'টাকেই অস্বীকার করেন। লেখা মানে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, কিন্তু দর্পণ প্রতিচ্ছবি নয়। তাই এটা বাস্তব, আবার বাস্তব নয়।

বস্তু-কাম (ফেটিশিজ্‌ম) দিয়ে মানুষের স্বাধীনতার এবং মুক্তির রাস্তা খোঁজা হচ্ছে। অবাধ যৌন-জীবনের যে পশুসুলভ 'গুণ' মানুষ বিবর্তনের ধারাতেই বয়ে এনেছে এবং 'মানুষ' পশুত্ব থেকে 'মানুষে' রূপান্তরিত হবার সময়েও যে-গুলো ধ্বংস হয়না, ফুটন্ত লাভার মত সচেতনতার স্তরে চাপা পড়ে থাকে, সেই অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষাই বস্তুকামের উৎস, আধুনিক বৈশ্য-সভ্যতা বার বার নানান ভাবে আঘাত করে এই পশু-প্রকৃতিকে সুযোগ করে দেয়, সেগুলো মাঝে মাঝেই বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের মত বিস্ফোরণ-ঘটে ; আমরা দেখতে পাই—বানতলা বা মুর্শিদাবাদের গণধর্ষণের ঘটনা। আর ? যেখানে কিছু প্রতিবন্ধকতা কাজ করে আমরা দেখি পণ্য-পুজোর (কমোডিটি ফেটিশিজ্‌মের) মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ! কমোডিটি ফেটিশিজ্‌ম (পণ্য-কাম) অতৃপ্ত পশু-সুলভ যৌনা-কাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির একটা ঘোর-পথ। 'বানতলার' সঙ্গে এর ফারাকটা অল্পই। মোটেই গুণগত নয়, একেবারে পরিমাণগত।

রক্তে (মস্তিষ্কে) বয়ে আনা অবাধ আত্মতৃপ্তির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক মানুষের অর্জিত সচেতন মননশীলতা, বর্তমান বৈশ্য-সভ্যতার 'রক্ত-মাংসের প্রতি লালসার' পথেও প্রতিবন্ধক এটাই, তাদের মুনাফা-লালসা লেলিহান শিখার মত 'স্বর্গাভিমুখী,' তাই তারা এই প্রতিবন্ধকতাটাকেই প্রধান রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই প্রতিবন্ধকতা যদি ভেঙে দেওয়া যায়, প্রত্যেকটা মানুষ-ই তার কামনা-বাসনার জ্বালায় ছুটবে তাদের কাছে। শুরু হবে একে অপরকে মাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা। এরই জন্য তাদের স্লোগান "'প্রতিবন্ধক' ভাঙো। ব্যবহার করো, লেসার থেকে বীমার সব—সব কিছু। কতক্ষণ খিল এঁটে দরজা বন্ধ রাখবে ?" 'সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের বিকাশের অন্তরায়,' তাঁদের দার্শনিকের মহান আবিষ্কার !

অন্যদিকে কিছু মানুষ চেষ্টা চালাচ্ছেন আদিমতার ওপর সচেতনতার প্রভুত্ব কায়েমের। তাঁরা মনুষ্যত্বের অহংকারকে প্রহরী হিসেবে দাঁড় করিয়ে মানুষকে তুলতে চাইছেন অন্য এক স্তরে। এক অহংকারী-প্রজাতি হিসাবে। এঁরা হলেন 'সহজাত প্রবৃত্তির' অবরোধকারী (পশু-সুলভ প্রবৃত্তি-সর্বস্বতার অন্তরায় !)।

প্রথম দল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র থেকে, এমন কি প্রকৃতি থেকে নির্বাসিত হয়ে তাদের কামান-বন্দুক, সোনা-দানা সব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষের 'মনের' ওপরে। মানবমনের সবচেয়ে বেশি বিস্মৃত স্তরটাকে টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলতে চাইছে তারা। 'বিবরে'র মাধ্যমে পাতালে পোঁছানো সেই কণ্ঠস্বর—'প্রজাপতি'র মত ডানা মেলে রঙ ছড়াবার হাত ছানি দিচ্ছে। কিন্তু মর্তবাসী মানুষ—গর্বিত মানুষ, সে চাইছে অহংকারের চরম সীমানায় পৌঁছতে। এটাই তো লেখকের বিষয়! লেখার বিষয়। চরিত্রের সাদৃশ্য তাই সর্বত্রই।

সব চরিত্রই লেখকের চরিত্র। তাই দেখি উন্মত্ত পুলিশ-চীফ নিজের ফ্র্যাঙ্কো-বিরোধী ভূমিকা ভুলে মেরে সত্যিকারের পশুদের মুক্ত করতে ব্যস্ত। গর্বিত-অহংকারী মানুষ গড়ার সংগ্রামকে অরওয়েল সাহেব 'প্রতিবন্ধকতা' ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রাসেল, ডিউ-ই; কে নয়? এদের বিরুদ্ধে বঙ্গকবি তাঁর ব্রাহ্মশালীনতা বজায় রেখে বললেন—'সমগ্র রাশিয়ান সমাজ এখন রোগাক্রান্ত, এখন তাকে ডাক্তারের চিকিৎসাতে থাকতেই হবে। রোগ সেরে গেলে ডাক্তারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে....।' রোগ সারার মুখে ডাক্তারকেই খতম করলেন তাঁরা। রুগী এখন খাবি খাচ্ছে, সুতরাং মানুষ শর্তাধীন হতে বাধ্য, মানুষ ভুলে যেতে চায়, একেবারে ভুলে যেতে চায় তার পশু-অরিজিন, তাই তো.... ।

আরম্ভ

পুলিশ চীফ মিঃ অরওয়েল এবং টিনের সেপাই

কোন জিনিস কেউ ভালোবাসেন তার কারণ এই নয় যে জিনিসটা নিজেই ভালো বা ভালোবাসা পাওয়ার অবস্থায় আছে! বরং উল্টোটাই সত্যি। ভালোবাসা পেয়ে থাকেই বলে জিনিসটা ভালো হয়ে যায়। এবং ভালোবাসা পাবার অবস্থায় পৌঁছে যায়।

নাহলে, মিঃ অরওয়েলের বুনোশুয়োর, ভাদুরে-কুকুর মুক্তি পাবার যোগ্য হয়ে ওঠে! স্তালিনের অন্যায়, তিনি এগুলোর

মনুষ্য-সমাজে অবাধ বিচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন, এদের যথার্থ জায়গা, খোঁয়াড়েই এগুলোকে আটকে রেখেছিলেন। মিঃ অরওয়েল হঠাৎ তাদের ভালোবেসে ফেললেন, অর্গলমুক্ত করে ছেড়ে দিলেন লোকালয়ে · । গোয়েবলস-এর 'মুণ্ডহীন ধড়খানা আহ্লাদে উঠোনময় নেত্য করে··· ।

ওদিকে রাজকুমারী ভালোবাসতেন তার টিনের সেপাইকে। সেটাকে তিনি বন্ধ করে রাখতেন তাঁর খেলনার বাক্সে। একটা জন্ম-দিনে রাজকুমারী তাকে মুক্তি দিলেন। মানে বাক্স থেকে বার করে জানালার ওপর খেলনা-দুর্গের পাহারাদার করে দেওয়া হয় তাকে।

রাজকুমার, রাজকুমারী নাচে, গায় হৈ-হুল্লোড় করে। সেপাই দাঁড়িয়ে থাকে অবিচল! তারও প্রাণ চায় ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে, পারে না। কারণ সে সেপাই! তাই বুকের সাধ বুকে চেপে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। অপলক দৃষ্টিতে টান টান বুকে মাস্কেটটা চেপে ধরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে সে। খেলনা-দুর্গ পাহারা দেয়···

অরওয়েল সাহেবের সদ্যমুক্ত শুয়োর এবং কুকুরগুলোকে সেই দিকে আসতে দেখে হাওয়ায় একটু নড়ে ওঠে সেপাই। টিং টিং করে একটা শব্দ হয়। ছুটে আসে রাজকুমার-রাজকুমারীর দল। তারাও পশুগুলোকে দেখে মজা পায় ·· । জানোয়ার বনাম টিনের সেপাই—এই মজাদার লড়াইটা দেখার জন্য তারা তাকে দুর্গ সমেত ছুঁড়ে মারে মুক্ত পশুগুলোর দিকে। ওপর থেকে পড়ার সময় শূন্যে ভাসতে ভাসতে সে বাগিয়ে ধরে মাস্কেটটা। ভাবে · 'আমি তো সেপাই!' একটা ময়লা রাখার জায়গাতে পড়ে, শুয়োর আর কুকুরগুলোর উল্লাসে তার আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়··· তার এই আর্তনাদ কেবলমাত্র শুনতে পায় খুকী রাজকুমারী। ছুটে নিচে নেমে আসে সে। শুয়োর, কুকুর আর রাজকুমারী মিলে খুঁজতে থাকে তাকে। যতই তারা ময়লা ঘাঁটে, সেপাইটা ততই ময়লার নিচে চাপা পড়ে। তারা কেউ তাকে খুঁজে পায় না।

অনেক দিন পরে, কাগজ কুড়ুনী ছেলের দল তাকে আবিষ্কার করে। ভালো একটা খেলনা পেয়ে তারা মনের আনন্দে তৈরি করে

এক নৌবাহিনী। তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় কাগজের নৌকার পাহারাদার করে। কাজ পেয়ে দারুণ খুশি সেপাই টান টান বুকে দাঁড়িয়ে থাকে …।

ড্রেনের স্রোতে নৌকা ভাসে। সেপাই দাঁড়িয়ে থাকে। কাগজের নৌকা টাল খায়। সেপাইয়েরও পা টলে যায়। কাগজের নৌকা ঘুরপাক খায়… সেপাইয়ের মাথা ঘোরে, তবুও সে তার পা'কে টলতে দেয়না। মাথাকে ঘুরতে দেয় না। নৌকা চলে অবিরাম… সেপাই তার কর্তব্য করে। নৌকা চলে টলতে টলতে, দুলতে দুলতে—সেপাই তার কর্তব্য করে… বুকের ব্যথা বুকেই থাকে। তারও খেলতে ইচ্ছে করে বলতে পারেনা, কারণ সে যে সেপাই…। দায়বদ্ধ সেপাই… !

ভাসতে ভাসতে নৌকাটা ড্রেনটা যেখানে প্রচণ্ড গর্জন করে নদীর সঙ্গে মিশেছে সেখানে পেঁছিলো। সেই স্রোতের তোড়ে নৌকা গেল ফেঁসে, অথৈ জলে পড়ে সেপাই… বাগিয়ে ধরে অস্ত্রটা। হোক না টিনের তবুও তো সে সেপাই…। সেপাই বাগিয়ে ধরে অস্ত্র **অ্যাণ্ডারসন** বাগিয়ে ধরেন কলম… !

অরওয়েলের মুক্ত বোয়ালটা টুক করে গিলে ফেলে তাকে। হান্স ভাবেন—'আহাঃ, ম্যাজিকাল ট্রিটমেণ্টে সেপাইটাকে জীবন্ত করলাম না কেন ?'

মাছের পেটের ভেতর অন্ধকার রাজত্বে গিয়ে পড়লো সে… সেপাই-এর দিন কাটে অন্ধকার রাজত্বে…। আজ আর কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ ভালোবাসে না বলেই আজ আর সে ভালো নয়।

বোয়ালটা কিন্তু ধরা পড়ে রাজার জেলের জালে। চার্চে ঘণ্টা বাজে … মন্দিরে পুজা হয়… মসজিদে উল্লাস। রাক্ষুসে বোয়াল জালে পড়েছে। এবার সকলে নিশ্চিন্ত। শুধু অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে সেপাইটা…। রাজার মাছকুটনি বোয়ালটার পেট কাটতেই সেপাইটা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। টান টান বুকে দাঁড়ায়। ভাবে বুঝি মুক্ত সে। ভুতুড়ে ব্যাপার দেখে মাছকুটনি বুড়ি তাকে ঠেলে ফেলে দেয় জ্বলন্ত উনুনে।

আগুনে পুড়তে থাকে সেপাই… সেপাইয়ের মতই। তার হাড়-

মজ্জা গলতে থাকে। আর ওদিকে আগুনে-বোমাতে বসরার গোলাপরাও মাথা নিচু করে ঝলসে যায়। লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। মা আর খোকা-খুকির মৃতদেহগুলিও জ্বলতে থাকে। তারা জ্বলে গোলাপকে আঁকড়ে ধরে, সেপাই জ্বলে হাতে তার মাস্কেট··· ।

পরের দিন উনুন পরিষ্কার করতে এসে রাজার 'ঝি' দেখে উনুনে ছাই-এর মধ্যে একটা ধাতব-খণ্ড। দেখতে ঠিক কলজের মত। রঙটা তামাটে। 'ঝি' সেটা হাতে নিয়ে ভাবতে থাকে, 'আহা এটা কে! কার কলজেটা পুড়ে এমন খাক্ হয়ে গেল!···

হান্স-এর কলজে পুড়ে খাক্··· ইঁটে জন্ম নিলো পদ্ম! লালসায় উজ্জ্বলারা ! অরওয়েলের পশুদের দাপাদাপি।

ঝি-এর 'আহা'! কথাটাতে তামাটে কলজেটার রঙ পাল্টাতে থাকে। পোড়া কলজেটার সূর্যের মত লাল টুকটুকে রঙে রূপান্তর দেখে হান্স বাগিয়ে ধরেন কলম। সত্য আর উজ্জ্বলারা একই সঙ্গে আবার মিছিলে হাঁটে··· পুকুরে পদ্ম ফোটে, তামা হয়ে যাওয়া মাটিতেই গোলাপের চারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বসরার জমিতে··· হান্স ভাবেন—'এবার গোলাপগুলোতে আরও লাল রঙ ধরাতে হবে। এর জমিতে যে অনেক খোকা-খুকুর রক্ত-মাংসের সার!' তাঁর রক্তে আগুন ধরে! 'বয়েলিং-ব্লাড কালার!' ফুটন্ত রক্তের রঙ আর ডুবন্ত সূর্যের রঙ তো একই··· । শিল্পী তুলে নেন তুলি। কিন্তু সমস্যা! এ রঙ তিনি কোথায় পাবেন? তুলি চেবান তিনি ··।

লাল কলজেটার খোঁজে ভালোবাসার (করুণার নয়) 'আহা' শব্দটা সম্বল করে অন্ধকারের রাজত্ব থেকে পৃথিবীর পথে ছিটকে পড়লাম আমি···।

রূপান্তরের খোঁজে—পৃথিবীর পথে

একাল

বিস্মৃত কোন ঘটনা বা ব্যক্তি যদি হঠাৎ সামনে এসে মাথা উঁচু করে কৈফিয়ৎ দাবি করতে থাকে, তখন আর বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। জেল থেকে মুক্তি যখন প্রায় নিশ্চিত জেনে গেছি,

বহু শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এসে বার বার সাবধান করে গিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য—"এই সাড়ে আট বছরে পৃথিবীটা পাল্টে গেছে। রূপান্তরিত সেই বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি থেকো। পৃথিবীটা আর তোমাদের মত কল্পস্বর্গবাসীদের জায়গা নেই। সেটা নরক হয়ে গেছে··· 'Lay those damned books aside!' ছুঁড়ে ফেলে দাও কেতাব! বাইরের পৃথিবীটা নরক হয়ে গেছে হে, নরক!"

সাহিত্যের অধ্যাপক আওড়ে গেলেন—" 'A world of omnipotence, profit, and delight, of power and of honor!' Lust for flesh, Lust for blood এবং Lust for power! এই তিনটেই হ'চ্ছে বর্তমান জগতের ধর্ম। এটাকে যদি ভালো বলো তো ভালো! যদি নরক বলতে চাও তো নরক! মোদ্দা কথায় এই সাড়ে আট বছরে সব পাল্টে গেছে··· ।"

অধ্যাপকের কথার সারমর্মটা হজম হতে না হতেই এসে হাজির হলেন কলমবাজ আদর্শবাদী বন্ধু, তাঁরও উপদেশ একটাই, 'কতদিন উটপাখির মত বালিতে মুখ গুঁজে এই ঝড় ঠেকাবে! মানসিক ভাবে তৈরি হতে থাকো! আমাদের মত মানুষরা, মানে এই তোমার বন্ধুরা মেফিস্টোফিলিসকে বোতল বন্দী করে পৃথিবীর শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত ভোগ করতে নেমে গেছি। হাঃ হাঃ হাঃ আমরা সকলেই ফাউস্টাস! A world of profit and delight, of power, of honor and omnipotence! লালসার এক লেলিহান শিখা তোমাকেও গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে আগুন জ্বল! দেখতে পাচ্ছো না? only blood can extinguish this fire!'

মাথা ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাহিত্যিক বন্ধু। আসলে শেষের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করার তেমন বাধা ছিলো না। যাঁরা আমার ভালো চাইতেন প্রায় প্রত্যেকেই আসতেন। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে সব ব্যাপারে-ই ভিন্নমত পোষণ করতেন। বোঝাবার চেষ্টা করতেন তাঁর জীবনাদর্শটাই ঠিক। বাইরে বেরিয়ে বাঁচতে গেলে তাঁর সঙ্গে ভিড়তেই হবে। এত পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেকেই কিন্তু একটা ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলেন—পৃথিবীটা পাল্টে গেছে।

আধুনিক মানুষ মানেই এক একটা ফাউস্টাস। তাঁরা আমাকে দেখে বিড়ম্বিত হতেন। কোন অভিযোগের আঙুল তুলতে পারিনি তাঁদের দিকে। সাড়ে আট বছর আগে ফেলে আসা মানুষগুলো এতটা পাল্টে যেতে পারে ভাবতে কষ্ট হ'ত। এক অদ্ভুত 'ডিলিরিয়মে' কাটতো সারাটা দিন। লড়াই করতাম নিজের সঙ্গে, নিজেকে বোঝানোর জন্য নিজেই চিৎকার করতাম 'নাঃ এ হ'তে পারে না! ওরা আমাকে 'কন্ডিশন্‌ড্‌' করতে চাইছে! আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতাম আমার বিশ্বাস। এই আঁকড়ে ধরতে ধরতেই নমনীয় আমি কখন যেন আমার বিশ্বাসে মৌলবাদী হয়ে গেলাম!

ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তুমুল তর্ক জুড়ে দিতাম—

'কারণ ছাড়া কাজ হয় না। কাজ ছাড়া ফল হয় না। সৃষ্টি যদি ফল হয় স্রষ্টা হ'চ্ছে কারণ ·'

'কিন্তু সব কারণইতো অজ্ঞাত···'

'না, জ্ঞাত এবং আপাতত-অজ্ঞাত, 'কারণ' এই দুই রকমের। যেটা আমরা জানতে পারিনি সেটা জানতে পারবো···'

'আমরা কি সব কারণ কোনদিন জানতে পারবো?'

'তাহলে তো মানুষ আর মানুষ থাকবে না··· একটা জড় বস্তুতে পরিণত হবে। জানার জন্য মানুষের সামনে কোন বস্তু নেই, সমাধান করার মত কোন সমস্যা নেই তার হাতে··· তাহলে সেই মানুষের মস্তিষ্ক আর হাত কী করবে? সে মানুষ তো ইঁট হয়ে যাবে।··· জানার এই দৌড়ই মানুষকে মানুষ রেখেছে····। তোমরা তোমাদের জীবনদর্শন দিয়ে এটাই বন্ধ করে দিতে চাইছো।'

'কিন্তু সব কারণই তো একই ফল দেয় না।'

'বটেই তো একই কারণ বিভিন্ন ফল দিতে পারে। এটা নির্ভর করে ব্যক্তি, বস্তু এবং সময়ের ওপর। যেমন ধরো কোকিলের ডাক কবিকে আনন্দ দেয়, বিরহীকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে, উন্নাসিকের কিছুই হয় না। একটা সুন্দর ফুল কোন প্রেমিকাকে আনন্দ দিতে পারে, গাছ থেকে ছেঁড়ার জন্য কবি ফুলটা দেখে কষ্ট পান, মালির কিছুই হয় না ··'

'কেন এটা হয় ?'

'হয় কারণ মানুষ ইউনিক ! Man is excellent than Heaven ! মানুষ স্বর্গের থেকেও সুন্দর ! কোকিল-ই বলো, ফুল-ই বলো—এসব বাহ্যিক শর্ত। ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ অবস্থাকে সেগুলো নাড়া দিয়ে শর্তাধীন করে তোলে মাত্র।···· সুতরাং তোমরা যে বলছো সকলে পাল্টে গেছে আমি বিশ্বাস করিনা। তোমরা বস্তুকামীরা আসলে অসুখী। তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের লোভে মেফিস্টোফিলিসকে বন্দী করতে চেয়ে নিজেরাই তার হাতে বন্দী হয়ে পড়েছ। মাটির অন্ধকার গহ্বর থেকে যে হলুদ ধাতব খণ্ড তোমরা তুলে আনলে, সেই আজ তোমাদের ঠেলে দিয়েছে অন্ধকারে। প্রথমে তোমরা এটাকে স্বীকার করতেই চাওনি, এখন এটা ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করো না। তোমরা স্বর্গরাজ্যে যেতে চাও, বিদ্রোহ করে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হতে ভয় পাও। 'কী', 'কেন', 'কীসের জন্য', এই প্রশ্নগুলোকে তোমরা ভয় পাও। এগুলো আজ বিদ্রোহের সামিল···'

'স্বর্গরাজ্য বলতে কী বোঝাতে চাইছো তুমি ?'

"বস্তুকাম। যেখান থেকেই তোমাদের বেস্ট-সেলর বলতে পারে গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরীদের ভিড় দেখে তাঁর মনে হয় একমাত্র তাঁর মা ছাড়া এই সব মেয়েরা তার শয্যাসঙ্গিনী ! এটাকেই 'unity of impact এবং unity of purpose', বলে চালাতে চাইছো ! এই লেখক কেন-যে তাঁর মা-কে বাদ দিলেন তিনিই জানেন।····"

'কিন্তু উইমেনস্ লিব ?'

'হাঃ হাঃ, তোমাদের কাছে এর অর্থ—নারীকে দেবী বলে পুজো করো তারপর তার গর্ভপাত ঘটাও ! কিংবা জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসো। তাহ'লেই কাব্যের বিষয় হতে পারে সে নারী। দুশ্চরিত্র রাজা, অরক্ষিত আশ্রম-কন্যাকে 'এলুর' করে বনবাসী অভি-ভাবকের অনুপস্থিতিতে শয্যা-সঙ্গিনী বানায়। কিশোরী গর্ভিণী হয়····রাজা চলে যায় তার স্বর্গরাজ্যে। রাজকবি লেখেন অমর কাব্য ! সেই একই ট্র্যাডিশন বয়ে নিয়ে চলেছ তোমরা···।'

'আসলে তোমরা মানুষের সহজাত ব্যাপার-স্যাপার-গুলো

অবরুদ্ধ করে দিতে চাও তাই তোমরা আমাদের এই পরিবর্তনটা গ্রহণ করতে পারছো না · '

"হ্যাঁ, আলবৎ চাই! সহজাত ব্যাপার মানে তো পশু থেকে যে মানুষ হয়েছিল, তার ফসিল! পাশবিক প্রবৃত্তি, তোমরা যেটাকে বলছো 'ইদ'। এক কথায় প্রবৃত্তি-সর্বস্বতা। ফসিলকে জীবন্ত করে তোমরা দেখাতে চাইছো—ভয়, অবাধ-যৌন-সঙ্গম, এগুলো সব নতুন! · অবশ্যই আমরা অহংকারী মানুষ চাই। 'ইদ'-এর অবাধ বিচরণকে মানুষের মস্তিষ্কে অবরোধ করতে চাই!'

'কিন্তু তাতে তো মানুষ অস্বাভাবিক হয়ে পড়বে?···'

'কেউ কেউ হয়তো পড়বে! চন্দ্রাহত এদের জন্য লুনাটিক এ্যাসাইলাম গড়ে দেবো আমরা···· সেখানে তোমাদের ঐ সমুদ্র-পারের স্বর্গরাজ্যটা সহ তোমাদের সকলকে জায়গা করে দেবো · কারণ তোমাদের তত্ত্ব অনুযায়ী ভাদুরে কুত্তী আর চড়ুই পাখিরাই সবচেয়ে স্বাভাবিক মানুষ····'

প্রগতিশীল নারী সংঘের তার্কিক মুখ লাল করে গুম হয়ে গেলেন। আসলে তিনি এসেছিলেন আমাকে আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাতে। সেখান থেকেই এত প্রশ্নের অবতারণা। আক্রমণটা হজম করে নিয়ে তিনি আবার শুরু করেন, 'কেবলমাত্র ভাত-কাপড় দিলেই····"

'····বলো ভাতার হওয়া যায় না! আক্রমণাত্মক যৌন-জীবন চাই, তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই · ইত্যাদি ইত্যাদি এই তো? এগুলো তারাই বলে থাকে যাদের যথেচ্ছ ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা আছে। তাঁরা পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, সর্বত্রই যৌনাঙ্গের অনুভূতি অনুভব করে থাকেন। সেগুলোর যত্নে তারা অপরিসীম যত্নবতী! খেতে ভালোবাসেন, কিন্তু রান্না করতে চান না। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ চান কিন্তু ঝাঁটা ধরতে আপত্তি! মা হতে চান কিন্তু গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করতে চান না। এক কথায় খর্বকায় মানুষ এঁরা। সকলেই যদি এই চাই—তাহ'লে কী হবে? কে কার জন্য রান্না করবে··· ?"

'না, আমি তা বলিনি, আমি বলতে চাইছি মানুষ কেবলমাত্র ভাত-কাপড়ে বাঁচে না, যদিও ভাত-কাপড় প্রাথমিক ব্যাপার। কিন্তু

ভাত-কাপড়ের সমস্যা মিটে গেলে মানুষ কী করবে ?···· যাদের-ভাত কাপড় নেই তারা না হয় 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' বলে ভাববে, যাদের সেই সমস্যা নেই তারা তো একটু আমোদ-প্রমোদ চাইবেই, বস্তুকামী হবেই। তাদের সমস্যা তো 'to earn moeny' নয়, 'to spend money ?'

এবার দম নেবার পালা আমার। অবাক হবার-ও বটে। মর্তবাসী বলে দাবিদার কেউ এ-ধরনের কথা বলতে পারে সেটা ভেবেই অবাক হলাম। ঠোঁটের কোণে সেই বিখ্যাত হাসি, না-স্বীকৃতি, না-অস্বীকৃতির হাসিটা হেঁসে বলি—'কেন যাদের ভাত-কাপড় আছে, তারা তাদের যোগাড়ে সাহায্য করবে। এতো সোজা কথা···'

'ধরে নিলাম করলো—সকলেরই ভাত-কাপড় হয়ে গেল—তারপর কী করবে ?'

'তোমাদের ঐ কৃষ্ণমূর্তি-মার্কা দার্শনিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে !'

'সেটা কী ?'

'প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ! প্রকৃতি যেটুকু জানতে দেয় সেটুকুই জানা যায়—এই তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করা।···· সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই প্রকৃতি চায় নি মানুষ নামক জীবটা টিকে থাকুক, প্রচন্ড বিরুদ্ধবাদী ছিলো সে।'

'হ্যাঁ জানি প্রকৃতিকে জয় করেই মানুষের অগ্রগতি !'

'ন্না'. চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'মানুষ কোনদিন প্রকৃতিকে জয় করে নি, মানুষ যা করতে পারে সেটা হ'ল প্রকৃতির নিয়মগুলো জানা। তার সীমাবদ্ধতাটা বোঝা। আর সেই সীমাটা অতিক্রম করা। এই জানাটা কোনদিনও শেষ হবে না।··· সেই দিনই মানুষ হবে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। ক্ষমতা নয়, ভোগ বা লালসা নয়, অনিবার্যতার রাজত্ব থেকে স্বাধীনতার রাজত্বে প্রবেশের সংগ্রাম। যা কিছু অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে সেগুলোকে আয়ত্ব করা ·· সুতরাং মনা, নির্বাচনে আমি দাঁড়াচ্ছি না।'

'তার মানে তুমি চাও না, বর্তমান শাসকরা হারুক, একটা পরিবর্তন আসুক ! বিপ্লবের শর্তগুলো তৈরি হোক !'

'আলবৎ চাই! কিন্তু রেভোল্যুট করে বলেই সেটা রেভো-লিউসান, আন্দোলিত হয় বলেই সেটা আন্দোলন। তোমাদের ঐ নির্বাচন হল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লেফ্‌ট-রাইট করা। 'রূপান্তরিত দুনিয়া' বলে যে বস্তুকামী পাশবিক মানুষগুলোকে তোমরা দেখাতে চাইছো সেগুলো হলো ফসিলের পুনর্জীবন! অবশ্যই এগুলো আমি চাই না!'

আপদ বিদায় হল, বুঝতে পারছি আর দু-তিন দিনের মধ্যেই বাইরের ঝড়ের সামনে পড়বো। এমনই সব সাতপাঁচ ভাবছি। অকৃত্রিম সুহৃদ অধ্যাপক এসে হাজির। সব শুনে বললেন—'আগে বেরোও, তারপর ওসব ভেবো। বেরুলে দেখতে পাবে এক নির্জন-দ্বীপে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। পণ্য-পুজার বিশাল বিশাল ঢেউগুলো তোমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। তোমার ঘরবাড়ি, ছেলেমেয়ে-বউ সবাইকে সে গ্রাস করেছে, হাজার মানুষের ভীড়ে তুমি থাকবে একা। এটাই হবে তোমার আসল লড়াই! আমরা তো হেরে গেছি, তুমি পারবে তো!' এক অদ্ভুত ভাষা তাঁর চোখে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন স্পষ্ট, অথচ তাঁর তো এই জিনিস হবার কথা নয়। বাড়ি, ঘর, সুন্দরী বউ, সুন্দর বাচ্চা, গাড়ি সব আছে, যেমন খুশী টাকা খরচ করতে পারেন, তবুও তাঁর এত কষ্ট কেন?

'নরক খুঁজছিলে না?' নিজের দিকে তর্জনীটা তুলে তিনি বললেন—"That which is not Heaven is Hell!' সমুদ্র-পারের ঐ রাজত্বটা আমাদের স্বর্গ! যে-দেশ সেটা নয়, সেটাই নরক! এটাই শিখেছি আমরা, এটাই শিখিয়েছি আমাদের ছেলে-মেয়েদের···আদতে আমরা বিশ্বাসঘাতক! পশু!"··· যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলেন তিনি। 'ইউ! সক্রেটিস অ্যামাং আস! তোমার কাছে ছুটে আসি নিঃশ্বাস নিতে। পুরনো আমাকে ফিরে পেতে! তুমি তাড়াতাড়ি বেরোও···'

"Ugly hell gape not, came not Lucifer,
I will burn all my books! Ah Mephistopheles···

যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রায়-প্রৌঢ় অধ্যাপক বেরিয়ে গেলেন··· যন্ত্রণার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়ে···। চিৎকার করে বললাম, 'কোথায় পালাবে! মেফিস্টোফিলিস ইজ এভরি হোয়ার!··· লালসার

আগুনে জ্বলছো তোমরা। ব্লাড ইজ দ্য ওনলি লিকুইড দ্যাট ক্যান এক্সটিঙ্গুইস দিস এ্যাম্বিশন, একমাত্র রক্ত দিয়েই তোমরা পারো নিজেদের আগুন নেভাতে।

দুই

বন্ধু অধ্যাপক কষ্ট দিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম আশার আলো। ভোগবাদী মানুষ অন্তর্দহনে জ্বলছে। জ্বলছে যখন তাকে আবার তার পশু-জীবন থেকে ফেরত আনা যাবে, না-মুক্তি, না-জেল, প্রায়-মুক্তি পর্বের শেষের ক'দিন বেশ কাটলো। বাঘ-সিংহদের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য ইঁদুর দৌড়কে জীইয়ে রাখতে ব্যস্ত একদল মানুষ অনবরত বিরক্ত করে গেল। হায়না-ধর্মী এই মানুষগুলো রীতিমত শাসিয়ে গেল। 'দেখি আমাদের দলে না ভীড়ে তুমি কোথায় যাও!' অধ্যাপক-বন্ধুর বিষাদমন্যতা এবং যন্ত্রণাবোধ দিনরাত একটা আশার আলো জ্বালাতে শুরু করল। মাথাকে আবার গ্রাস করল—"বাবাই, তিন্নি। এই ঝড় থেকে ওদের বাঁচাতে হবে।'

বিভিন্ন পেশার মানুষ এই কয়দিনে মোলাকাত করে গেলেন। অভিনেতা, লেখক, অধ্যাপক, ছাত্র কে নয়? এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য প্রত্যেকেই আড়ালে অপরের নামে কুৎসা করে গেলেন। একসঙ্গে খাচ্ছে, ঘুরছে, গাড়ির মডেল আর বাড়ির আসবাব নিয়ে আলোচনা করছে অথচ কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। অদ্ভুত এক কৃত্রিমতা। অধ্যাপক দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, অভিনেতার দিকে তাকিয়ে।—'ইস! জানো ঐ ব্যাটা এত তেল মারতে পারে! টি-ভি সিরিয়লের বিশটা স্ক্রিপ্ট্ ঠিক বাগিয়ে নিল! আমার দ্বারা বাপু ওসব হবে না। মন্ত্রী, মণ্ডি হাউস, অতসব হুইস্কি মারতে পারবো না···।' শুনে ভালো লাগল, বললাম—'যাই হোক না কেন তুমি অধ্যাপক! এটুকু ভুলো না।' 'হ্যাঁ সেটাই হয়েছে মুশকিল! একটা 'বোধ' কাজ করে!' পরের দিনই অভিনেতা বন্ধু এসে হাজির। অধ্যাপকের নাম ধরে একটা অশ্রাব্য খিস্তি আউড়ে বললো—'জঘন্য! তোমার বন্ধু জঘন্য। শেষ পর্যন্ত

কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, মাণ্ডি হাউস থেকে স্ক্রিপট্‌টা বাগিয়ে নিল।... এটা বাগাবার জন্য কী না করেছে! ছিঃ ছিঃ ওরা নাকি আবার রাজনীতি করতো!' কেবিনের দরজার দিকে তাকিয়ে বুক হিম! দেখি অধ্যাপক দাঁড়িয়ে সেখানে। আমি প্রমাদ গুনছি। কী হয়, কী হয় ভাব। ওঃ হরি, দেখি অভিনেতাবন্ধু তাঁর দু-হাত ধরে কান-এঁটোকরা-হাসি দিয়ে অধ্যাপককে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এই ভদ্রলোক এতক্ষণ যা বলছিলেন, সেটা কি মিথ্যে! আমি কি ভুল শুনেছি? না, ভুল দেখছি? তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে ব্যস্ত।—আমি ভেবে যাচ্ছি। শেষ কথাটা কানে এলো, অভিনেতা বন্ধু বিদায় নিয়ে উঠতে যাচ্ছেন। যাবার সময় বলে গেলেন—তাহ'লে পুলিশ কমি-কশনারকে একটু বলে দিও।' অধ্যাপক ওঁকে আশ্বস্ত করলেন। অভিনেতা চলে গেলেন, 'উফ্‌ কী দুর্দিন তুমি বুঝবে না! ভেতরে আছো ভালোই আছো! গাড়িতে একটা টি-ভি লাগাবো বলে কতদিন ঘুরছি! বেশ আছো তুমি, বুঝলে?' এই অভিনয় দৃশ্যটা হজম করে নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল, 'হেসে বললাম 'তা বেশই আছি। বেশ্যাবৃত্তিতে নেই। আচ্ছা তোমরা কি সন্তুষ্ট হতে পারো না? এত টাকা নিয়ে করবেটা কী? তোমার তো সবই আছে তবুও অন্যেরটা দখল না করলেই নয়?'

'কী বলছো যা তা! উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া বড় হওয়া যায়? প্রতিযোগিতা ছিল না বলেই তো সমাজতন্ত্র মার খেল! থাক ওসব কথা, যেদিন বেরুবে গাড়িতে করে পৌঁছে দেবো।' আবার হাসলাম। 'ওঃ তুমি তো আবার বাংলা বোঝো না! একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন।' এই যুক্তিহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্ছিষ্ট ভোগের তীব্র প্রতিযোগিতা, এই বিষাদমন্যতা মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে। এটাকেই এরা বলছে 'রূপান্তরিত মানুষ!' নতুন হাওয়া! এই মানুষ গড়ার জন্যই পাস্তেরনক, শলোখভ, অরওয়েলদের এত কালি-কাগজ নষ্ট! এই মানুষ গড়ার জন্যই রাসেল, ডিউইদের এত চিৎকার! এরা স্বাভাবিক? স্বাভাবিকতার অভাবকেই এরা স্বাভাবিক বলে চালাতে চাইছে, পারম্পারিক

ব্যবহারে অভিনয়প্রিয়তা এবং কৃত্রিমতাটাকেই এ'রা বলছেন—সৌজন্য, Impact of unity! এই অস্বাভাবিক আচরণকে ঢাকার জন্য বাহ্যাড়ম্বর! অবজ্ঞা! পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট, এবং কুচক্রী, এই বিদ্বেষ এবং কুচক্রকেই এরা বলছে মানবিক গুণ! এই জটিলতা সৃষ্টি করতে পারাটাই নাকি মহৎ সাহিত্যের কর্তব্য।

এক ব্যাঙ্ক অফিসারের সঙ্গে জীন্‌স্‌-পরা অধ্যাপককে দেখে শিউরে উঠেছিলাম, অধ্যাপককে সাবধান করতে গিয়েও ভাগ্যিস করিনি। আজ তো একজনের সর্দি হলে অন্যজন রুমাল বাড়িয়ে দেন। অথচ এই অফিসার ভদ্রলোকই আমাকে উত্তেজিত করেছিলেন এই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। এ'র বিরুদ্ধে সেদিন কয়েকদফা অভিযোগ এনে বলেছিলেন—'তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর টাকা মেরে দিয়েছেন উনি। কংগ্রেস, সি-পি-এম, পুলিশকর্তা, কাগজের মালিক প্রত্যেককেই নাকি সব রকমে তোয়াজ করে ক্যারিয়ার গড়ছেন! এই তোয়াজ করার পদ্ধতির মধ্যে সুরা-নারী সবই থাকে না কি! বোঝাতে চেয়েছিলেন নকশালদের উচিত ওকে খতম করা! সেদিনও শিউরে উঠেছিলাম। আবার ওদের একসঙ্গে দেখে আঁতকে উঠলাম। ওরা উঠলেন, কোথায় যেন যাবেন! বুঝলাম জাহান্নামে! আর 'way to hell is always rosey.'

এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম 'আজকাল' সম্পাদক অশোক। নিজে আসে নি, আসার চেষ্টাও করেন নি। বিভিন্ন চিরকুটের মাধ্যমে বার বার উৎসাহ দিয়ে গেছে। বার বার বলে গেছে, 'কখনো ভাববেন না আপনি একা! এত খারাপ অবস্থা নয়।'

মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত আসতো ফেলু, শুদ্ধব্রত এরা সকলেই। আসতো না উজ্জ্বলা, তবে মাঝে মাঝেই ঢুঁ মারতো শুদ্ধর প্রেমিকা। এ'রা স্বপ্ন দেখে, এ'রা স্বপ্ন দেখে আবার সংগ্রামের। তর্ক করে এ'রাও। ভাবি 'ডুবন্ত সূর্যটা লাল, আবার নতুন সকালের সূর্যটাও তো লাল, দাদারা ওদের স্বপ্ন দেখাটাই ভেঙে দিচ্ছে বার বার! মানুষ তাদের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করছে, ফলে এদেরও গ্রহণ-যোগ্যতা কমে যাচ্ছে। এদের কোন দোষ নেই, তবুও মানুষ এদের অবিশ্বাস করছে। হতাশ।

ফেলু নির্বিকার, শুধু সব দেখে যায়। ক্ষুব্ধ শুদ্ধব্রত প্রশ্ন রাখে—'হৃদয় ভাঙাভাঙি নিয়ে তো অনেক কাব্য, অনেক নাটক হল, হৃদয় ভাঙলে সে হয় খলনায়ক, দেশ ভাঙলে দেশদ্রোহী, কিন্তু স্বপ্ন যারা ভেঙে দেয় তাদের কী বলবে তুমি ? · ' 'মাথা নিচু করে শুনি, নিজেদের স্ব-অর্জিত পাপে নয়, আমাদের প্রজন্মের পাপের দায়-ভাগ বহন করে এরা সর্বস্বান্ত হতে চলেছে। আমাদের প্রজন্মের লালসা এদের বিচ্ছিন্ন করেছে, আবার আমরাই চিৎকার করছি—'তোমরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন !' ভেতরটা জ্বলতে থাকে, শুদ্ধ স্বপ্ন দেখে—'আবার গ্রাম থেকে নিষ্পাপ মানুষগুলোকে মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করে আঘাত করবে !' ফেলু স্বপ্ন দেখে, 'কফি হাউসে, মেয়ে, মদ আর শেয়ার মার্কেটের জায়গা নেবে বিদ্রোহ আর বিপ্লবের গল্প ! এক কাপ কফি তিনজনে ভাগ করে খাবার দিন ফিরে আসবে। সারাদিনের অভুক্ত বেকার বন্ধুকে কেউ বলবে না, 'ওঃ তুমি কখন থেকে বসে আছ ? সকাল থেকে ? ওঃ দেখো না, কী হ্যাজার্ড ! ব্যাঙ্কে গিয়ে আটকে গেলাম। তোমাকে ভাই আর একদিন আসতে হবে, দেখি কী করতে পারি।' দু-ঘণ্টা ব্যাঙ্কে থেকে খুব ক্লান্ত উনি ! 'ঈস্ কী করে চলছে তোমার ? দু-দিন বাচ্চাটারও খাবার জোটে নি ? আজকের যুগে ওসব বোকামি কেউ করে !···' 'এই যে ইসমাইল ! চিকেন এক প্লেট, দো টোস্ট ! চার চিকেন স্যান্ডউইচ ! একঠো কফি—হ্যাঁ ব্ল্যাক···বেগার সুগার !' বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বন্ধু সদ্য-বিবাহিত ছাঁটাই বন্ধুর দিকে তাকাল, 'শোন ঘোষ ! ওসব অ্যানার্কিজমের কোন মানে হয় না।··· আচ্ছা কিছু মনে করো না আমি একটু খেয়ে নিই ! সেই কখন ১২ টায় খেয়েছি !' ঘোষ কাউন্টারের ঘড়িটা দেখল—'চারটে দশ !' চার ঘণ্টাতে এদের এত খিদে, এত ক্লান্তি ! অথচ কাল দুপুর থেকে এক টাকার মুড়ি খেয়ে আছে সে।

ঘোষ-বন্ধু ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে থাকেন অম্লান বদনে। একবারও কী তার মনে পড়ে না এই অভুক্ত মানুষটা কতদিন নিজের ভাত তাকে তুলে দিয়েছে ! ঘটনা এবং ঘটনার দৃশ্যটা বর্ণনা করতে করতে ফেলুর গলা ধরে আসে—'আজিজুলদা, বেরিয়ে যে-কোন জাহান্নামে যেও, কফি হাউসে যেও না ! ওটা নরক হয়ে গেছে !'

তাই ফেলন্ন স্বপ্ন দেখে, তার প্রিয় কফি হাউস নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, কিন্তু এখনও জানা হয় নি বাবাই, তিনি কী স্বপ্ন দেখছে ? আমি জেলের শেষ ক'টা দিন হাসপাতালের বিছানায় শ্নয়ে ওদের স্বপ্ন দেখাটাই দেখতে থাকি।

অশোক চিঠি দেয়—একেবারে ভাববেন না আমরা আপনাকে করুণা করছি। আপনি লেখা দেন, লেখা লোকে পড়ে, তাই আমরা আপনাকে কটা টাকা দিয়ে থাকি !...আপনি একা নন।...

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভগবান শয়তানকে স্বর্গচ্যুত করেছিল কারণ সে তার নিজের হাতে গড়া মূর্তিটার কৃতিত্ব ভগবানকে দিতে চায়নি। 'আদম' গড়ার মাল মশলা জ্নগিয়েছিল ভগবান, কিন্তু তার স্রষ্টা শয়তান, এই বিদ্রোহ ভগবান বরদাস্ত করেনি—তাকে নিক্ষিপ্ত করেছিল নরকে। আদম স্বর্গচ্যুত হয়েছিল কারণ সে জানতে চেয়েছিল কোথা থেকে কী হয়। 'ইভে'র লোভ আর শয়তানের প্ররোচনা —আদম কে ঠেলে দিয়েছে পৃথিবীকে আবাদ করতে।

এমনি ভাবেই ক্ষমতাবান মান্নষ সৃষ্টি করেছে ভগবান আর শয়তান দ্ন-জনকেই। দাবী করেছে পরিশ্রমের মর্যাদা চাইবে না। সেটা হবে বিদ্রোহের সামিল আর বিদ্রোহ মানেই আদিম-পাপ এবং পাপ মাত্রই শাস্তি যোগ্য। স্বর্গরাজ্যের প্রসাদভোজী জ্ঞানী-গ্নণী ঋষিরা ভষ্মীভূত করলেন—চার্বাককে। তার হাড়ের চিহ্ন পর্যন্ত লোপাট করে দেবার জন্য 'তস্কর' দিয়ে সেই 'অস্থি' ল্নঠ করানো হল। নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত করা হল পিঙ্গল (কপিল) বর্ণ জ্ঞানীকে। 'যাও নরকে যাও।... আ ওয়াল্ড অব প্রফিট/অব অনার অ্যান্ড অমনিপোটেন্স !'

নির্বাসিত শয়তান কী করলো ? 'কুছ পরোয়া নেই। আমি তো আছি। কোথায় আছি সেটা বড় কথা নয়' :

"দ্য মাইণ্ড ইজ ইট্স্ ওন প্লেস, অ্যান্ড ইন ইটসেলফ
ক্যান মেক আ হেভেন অব হেল, আ হেল অব আ হেভেন।

হোয়াট ম্যাটার হোয়ার, ইফ বি স্টিল দ্য সেম,
অ্যান্ড হোয়াট আই শুড্ বি, অল বাট লেস দ্যান হি
হুম থানডার হ্যাজ মেড গ্রেটার ? হেয়ার অ্যাট-লিস্ট
উই শ্যাল বি ফ্রি ; দ্য অল মাইটি হ্যাজ নট বিল্ট
হিয়ার ফর হিজ এনভি, উইল নট ড্রাইভ আস হেন্স ;
হিয়ার উই মে রেইন সিকিওর, অ্যান্ড ইন মাই চয়েস,
টু রেইন ইজ ওয়র্থ অ্যাম্বিশান দো ইন হেল ঃ
বেটার টু রেইন ইন হেল দ্যান টু সার্ভ ইন হেভেন।…"

বজ্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সর্বশক্তিমান ঐ লোকটার থেকে আমি কম কীসে ! আমি এখানেই রাজত্ব করবো। কারিগর শয়তানের অস্ত্র ছিলো জ্ঞান-বৃক্ষের ফল, সেই তো গড়েছে স্বর্গরাজ্য, সেই তো সৃষ্টি করেছে বিশ্বকর্মাদের, সুতরাং গড়ে উঠলো আর এক রাজত্ব, শয়তান আর ভগবান দুজনে মিলেই হামলা করলো মানুষের ওপর। একজন অস্ত্রশক্তি দিয়ে, অন্যজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাদু নিয়ে।….

যে গণেশ ছিলেন মানুষের প্রতিনিধি-শ্রেষ্ঠ, গর্বিত মানুষের অহংকার, বার বার প্রতিহত করেছেন শয়তান আর ভগবানের আক্রমণ ; যাঁর সম্পর্কে বলা হল : 'এর নাম উচ্চারণ করলে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটবে, ফসলভর্তি মাঠের দিকে তাকিয়ে এঁর নাম নিলে মাঠ ফসলশূন্য হয়ে যাবে ;… গোধন ভষ্মীভূত হবে…', তাঁর মূর্তি হল অর্ধেক পশু, অর্ধেক মানব। (সুররিয়েলিস্টিকরা কী বলেন? সুরেরাই, মানে ভগবান আর শয়তান যৌথ ভাবেই এই চিত্র এঁকেছিলেন প্রজাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নায়কদের সম্পর্কে, অরওয়েল সাহেবও তাই করেছেন !)

তিনি বার বার প্রতিহত করছেন ভগবান আর শয়তানের যৌথ আক্রমণ তাই জন্ম নিলেন চাণক্য…। 'আ ওয়ার্ল্ড' অব প্রফিট/ অব অনার অ্যান্ড অমনিপোটেন্স !" 'সর্বাধিকারী' মানুষ তার সৃষ্ট ভগবানের মতই পৃথিবীর বুকে 'লা-শারিক' (ভাগীদার সহ্য করতে রাজী নয়) হতে চায়।

' তাই যদি হতে চান মহারাজ, অস্ত্রশক্তিতে জনগণকে পরাভূত করতে পারবেন না। এগুলোতে আছে প্রচুর সম্পদ, গণ-এর বর্বর

অধিবাসীগণ তার ব্যবহার জানে না। এই সম্পদ আপনার হাতে এলে আপনি সমাজ বা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে যাবেন। রাজকোষ ভরে যাবে সোনায়! তবে মহারাজ ওদের পরাজিত করতে হলে অস্ত্রশক্তিতে পারবেন না, কারণ ওরা বিশ্বাস করে নিজের মস্তিষ্কের ওপর, হাত দুটোর ওপর। ওরা সম্পূর্ণ মানুষ! ওরা পরস্পরকে বিশ্বাস করে চলে। কেউ কাউকে হিংসা করে না। পার্থিব বস্তু সম্পর্কে ওরা নির্মোহ। সেগুলোকে ওরা ব্যবহার করে সকলেই। ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য জানার জন্য ওদের চাহিদা নেই। তাই ওদের লোভ নেই। আর লালসাবিহীন মানুষ অপরাজেয়। ওরা পাপ করে না বলেই পুণ্যের কথা ভাবে না। ভগবান আর শয়তান কাউকেই স্বীকার করে না এবং তাই ওদের লালসা নেই…। …সুতরাং মহারাজ! প্রথম কাজ হবে ওদের লোভী করে তোলা। লালসাতে উন্মত্ত করে তোলা—যাতে ওরা শৃগালধর্মী হয়ে একে অপরকে মাড়িয়ে যাবার দৌড়ে নেমে পড়ে ·· এর জন্য মহারাজ! প্রথমে প্রেরণ করুন ধর্ম। জাদুকর ধর্মপ্রচারক। কারণ আমাদের সকলের মতই ওরাও পশু থেকে উদ্ভূত। (যেমন আপনারা ময়ূর থেকে?) পাশবিক গুণাবলী নির্মূল হয় না। মাটির তলায় পুরানো উত্তপ্ত পৃথিবী এখনও ফুটছে, মানুষের রক্তে সেই আদিম পাশবিক মনোবৃত্তি এখনও ফুটছে, ধর্মীয় প্রচারকরা সেগুলোর উৎসমুখ খুলে দিলেই সেগুলো ফুটন্ত লাভার মত বেরিয়ে আসবে, সেই লাভাতে ধ্বংস হবে ওদের জনপথ লালসার পেছনে পেছনে পাঠান সুন্দর অলংকারাদি সজ্জিত নগরবাসিনী, তাদের সঙ্গে থাকবে সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি এবং সুরা। ওরা প্রলুব্ধ হবে।… তারপর আপনি সন্ধি করুন।… গণপতিদের ক্ষমতালিপ্সু করুন ক্ষমতার স্বাদ দিয়ে। জনপদগুলি দখল করুন।'

'মহারাজ! ধর্মীয় প্রচারকরা প্রথমে কোন জনপদে গিয়ে দেবমূর্তি কোন পুষ্করণীতে ফেলে আসুক! কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে মাটি খুঁড়ে আলগা মাটির ওপরে ছোলা, বা গমজাতীয় বীজের ওপর সেগুলি স্থাপন করে প্রচার চালাক—এখান থেকে সর্বশক্তিমান ভগবান উঠবেন।… সরলমতি জনপদবাসী এই

জাদুতে আকৃষ্ট হবে। প্রচারকগণ কয়েকদিন যাবত সেইখানে অবস্থান করে জল ঢালবে। তিনদিন পরে বীজগুলোর অংকুরোদ্গম ঘটবে—তার চাপে আলগা মাটি ফুঁড়ে দেবমূর্তি ভেসে উঠবে। জনপদবাসী চমৎকৃত হবে। 'বিশ্বাসী' হয়ে শর্তাধীন হয়ে উঠবে। দেব-দেউল গড়ে উঠবে। পুজো-আচার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি-গ্রস্ত হয়ে উঠবে। কারণ—নৈবেদ্য ঘুষেরই নামান্তর…।'

গণেশ চণ্ড থেকে সিদ্ধিদাতা হয়ে গেল। জনপদশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার স্বাদ পেলেন। "গণ" বা প্রজাতন্ত্র বিলোপ হল…। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হলেন রাজা।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি হল। খ্রুশ্চভ মহান হলেন, গর্বাচভ নবেল পেলেন, বৈশ্য সভ্যতার ডালির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন—ইয়েলেৎসিন। আমার একদা-সাথীরা শাসক হলেন। 'দেশদ্রোহী' এবং 'লাল ডাকাতের' দল বলে যাদের বলা হত তাঁরা হলেন—মহান দেশপ্রেমিক। বন্ধুরা ভিড়ে গেলেন—ইঁদুর দৌড়ে। অধ্যাপক, কেরানি, লেখক সকলেই পারস্পরিক সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে আত্মজাহির, এবং একে অন্যের ওপর থাবা বসাবার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়লো…

॥ দুই ॥

যূথিকা দেবীর আগমন এবং কিছু কথা

পাহারাদার গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জানালেন—'স্যার যূথিকাদেবী এবং তাঁর সঙ্গে একটা লোক এসেছে, দেখা করতে চান।' হাসপাতালের নিজস্ব বীজাণুনাশক গন্ধকে ছাপিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই একটা গন্ধ নাকে আসছিল, এখন বুঝলাম কারণটা কী, জিগ্যেস করলাম—'কে যূথিকা দেবী?' ইন্সপেক্টর আকাশ থেকে পড়লেন—'সে কি স্যার জানেন না! জয় বাবা তারকনাথ অপেরার ডাকসাইটে নাচিয়ে নায়িকা! আজও তো ওনার ছবি কাগজে আছে!'

ভাবলাম সত্যিই মহা অপরাধ করে ফেলেছি। এইরকম একটা নাম না শোনাটা অপরাধ তো বটেই। শুনিইনি যখন তখন কী আর করা যাবে। ইনি যখন জেনেই গেলেন আমার জানার বহর

আর একটু বোকা হলে আপত্তি কিসের ? জিজ্ঞাসা করলাম—'কোন পালাতে এখন অভিনয় করছেন ?'

'উনি তো এ বছর চারখানা পালার নায়িকা, এখন আছেন বুঝি 'হায়না কেন কাঁদে' !'

'কী বললেন ? আবার একবার বলুন !' একটু হকচকিয়ে গিয়ে আবার একবার পালাটার নাম জিগ্যেস করলাম, উনি একই নাম বললেন।

'আপনি ভুল করছেন, নামটা বোধহয় হাসে হবে, কাঁদে নয়।' —'গোয়েন্দা অফিসারকে শুধরে দেবার চেষ্টা করলাম। আমার অজ্ঞতায় এবার গোয়েন্দা অফিসার হেসে ফেললেন—

'না স্যার ! ঠিকই বলছি ! হায়নারা হাসে না, কাঁদে, কখন কাঁদে জানেন—যখন বাঘ সিংহের ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্টগুলো শেয়াল এসে খেয়ে যায়।···· 'আর' একটু থতমত খেয়ে বলবো কী বলবো-না ইতস্তত করে বলেই ফেললেন··· 'ওরা নিজেরা তখন একে অপরকে সন্দেহ করে মারামারি শুরু করে দেয়, তখন ওদের চিৎকারটা শুনবেন খ্যাক খ্যাক করে হাসির মত শোনালেও কান পেতে শুনলে বুঝতে পারবেন ফারাকটা··· খাবার পেলে যে হাসি দিয়ে ওরা ডাকে, এটা সেরকম নয় একটু অন্য ধরনের··· অনেকটা ফুঁপিয়ে কান্নার ফোঁপানি মেশানো হাসি···'

'পালাকার তো বেশ এলেমদার লোক ! আজকাল যাত্রাতে এতসব সূক্ষ্ম ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে না কী ?'

'প্রচুর পয়সা আছে স্যার ! বড় বড় গল্প-লিখিয়ে, নাট্যকার সব এই লাইনে ভীড়ে গেছেন ! ব্রজেনবাবুদের যুগ আর নেই··· আজকের কাগজেই বিনোদন পাতায় পালাটার রিভিউ আছে স্যার, পড়বেন ?' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অফিসারকে বললাম—'ওনাকে একটু মানে মিনিট পাঁচেক পরে পাঠাবেন, আর কাগজটা দিন তো !' একটু হোম-ওয়ার্ক করে নেওয়া ভালো, কী জানি কী ব্যাপারে আবার 'নায়িকার' আবির্ভাব কেন ?

গল্পটা সেই ত্রিকোণ প্রেমের ব্যাপার। তবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে পালাকারের অভিনবত্ব আছে। আয়কর অফিসার, পুলিশ অফিসার, আইনের একজন ছাত্র, এবং লালবাতি এলাকার একজন মাস্তান

এঁরাই হলেন নায়ক, খলনায়ক সব। নায়িকা একজন সুন্দরী বার-কাম-কল গার্ল। ইনকাম ট্যাক্সের ইন্সপেক্টর কর্মসূত্রে বারটাতে যাতায়াত করেন। বারের ম্যানেজার কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচাতে তাঁকে ভিড়িয়ে দেয় এই নৃত্যপটিয়সী লাস্যময়ীর সঙ্গে। ক্রমশ নানান অবরোধ ভেঙে যায়। ছেলে-মেয়ে-বউ সকলেই উধাও হয়ে যায় চোখের সামনে থেকে। তাঁরা বিস্মৃতির পাথর চাপা পড়ে যান। আলো, নাচ, শরীরের নানান অঙ্গভঙ্গিতে অবশেষে ইন্সপেক্টর ঢলে পড়েন।···

অন্যদিকে আইনের এক ছাত্র ওখানে যাতায়াত করেন। সত্যি সত্যি ভালোবাসেন মেয়েটিকে। মেয়েটাও নিম-রাজী, কিন্তু এই জীবন ছাড়তে পারছে না। এত ঝুঁকি নিয়ে সাদা-মাটা জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিরুদ্ধে সে। সে-একটা স্বাচ্ছন্দ্যময় কেয়ার-ফ্রী জীবনের মত আর্থিক সঙ্গতি চাইছে। আবার ছেলেটাকেও ছাড়তে রাজি নয়। তরুণ তার মনের খোরাক।

একদিন আয়কর-অফিসার আবিষ্কার করে ফেললো—ওদের দুজনকে একই সঙ্গে। অন্য একটা জায়গায় অন্য পরিস্থিতিতে। ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে সে। লালসার আদিম প্রবৃত্তিতে জ্বলতে থাকে সে। মালিককে হুমকি দেয়। তার কাগজপত্র নিয়ে হঠাৎ খুব সিরিয়স হয়ে ওঠে। সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার এই অসৎ-চক্রের তিনি শেষ করবেন-ই এইরকম একটা ভাব। মালিক মুখ টিপে হাসে। পোষা ভাড়াটে মাস্তান 'বুলেটে'র ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়··· 'চ্যাঙড়াটাকে বাবুর পথ থেকে হাটাও! বাবুর আরামের তকলিফ যেনো না হয়!'

একদিন খুন হল তরুণ। যথারীতি পুলিসের আর্বিভাব, থানার তরুণ ভারপ্রাপ্ত অফিসার—স্কুল মাস্টারের ছেলে। ভালো খেলোয়াড় হিসাবে চাকরি পেয়েছে। যতদূর সম্ভব সততার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করে। ধরে ফেললো পোষা মাস্তানটাকে। বার-মালিক বাঁচার জন্য তরুণী নাচনেওয়ালিকে নির্দেশ দিল··· অফিসারকে নাচাও! মদ-জুয়া, বে-আইনী অস্ত্র ব্যবসাতে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। এ-সব তাঁকে করতে হচ্ছে কারণ মেয়েটা তাঁকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে। ও দিকে ইনকামট্যাক্স বাবু হাবু-

ডুবু খাচ্ছেন। সুতরাং থানার অফিসারের সামনে মেয়েটিকে ঘরে তোলার দুটো বাধা—(এক) টাকা, (দুই) এই ইনকামট্যাক্সবাবু।

ইনকামট্যাক্সবাবু একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়লেন—বিশ্রী অবস্থায় 'শ্লীল' পুলিস স্কোয়াডের হাতে। উদ্দাম অফিসার সব ভুলে মেতে রইলেন। আর কোন বাধা নেই। এখন টাকা চাই, টাকা···আরও টাকা···।

মেয়েটার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে ছাত্রটির কথা। বিষাদগ্রস্ত হয়ে যায়। পরক্ষণেই তার চোখে ফুটে ওঠে একটা ক্রূর ভাব··। ইতিমধ্যেই দক্ষতার পরিচয় দিয়ে পুলিস অফিসার গোয়েন্দা দপ্তরে প্রোমোশন পান। বলে—'এ সবই তোমার কপালে··', মেয়েটা হাসে। বলে—'এই টাকাতে আমাকে পুষতে পারবেন না স্যার!'

এক রাজনৈতিক অস্ত্র-ব্যবসায়ীর সঙ্গে বারে বসে টাকা লেন-দেনের সময় ভিজিলেন্সের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যান তিনি···

জেলের ভেতর একই 'ফাইলে' থাকেন তিনজন। ইনকামট্যাক্স-বাবু, পোষা মাস্তান আর পুলিস-গোয়েন্দা। চোরা-পথে মদ আনায়, গাঁজা খায় ··পরস্পরকে অশ্রাব্য গালাগালি করে। মারামারি করে। মেট-পাহারা ওদের এই বেলেল্লাপনা বন্ধ করার জন্য বেল্ট চালায়। ডুকরে কাঁদতে থাকে ওরা···

এদিকে লাস্যময়ী, নাইটি পরে ম্যানেজার-কাম-মালিকের কোলে বসে আদর খায়···চোখ ঘন হয়ে আসে · ওরা বিছানায় যায়···

জেলের ভেতর এরা তিনজন ঠাকুর শ্রীশ্রীবাবাদের ছবির সামনে ধূপ জেবলে বসে থাকে···।

গল্পের প্লটটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বুঝলাম যাত্রা তার লোকায়তিক কনটেন্ট হারিয়েছে। এই কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়বে·· গ্রামে, গঞ্জে, কয়লাখনি অঞ্চলে। এ যেন আমার সুন্দরী মেয়েটাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে হারেমবন্দী করে বাইজি বানানো। প্রচুর পয়সা, শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে তাকে নাচের আসরে এনে 'বাবা-আমি'কে নেমন্তন্ন করে সেই নাচ দেখতে বলা···। বুকের ভেতরটা চিন চিন করে উঠলো···।

কোথায় গেল ফাঁকা মাঠে ত্রিপল টাঙিয়ে হ্যাজাকের আলোয় সেই চিৎকার। জমিদারের অত্যাচার, সাহেব পেটানো, কিংবা

বাহাত্তুরে বুড়োর 'আলুর দোষ'-কে চিৎকার করে জাহির করা…। মাঝে মাঝে বিবেকের গান, আর অক্ষম মানুষদের গায়ের জ্বালা মেটানোর জন্য ঢোলক কিংবা হাঁড়ি বাজিয়ে 'বাবু'দের পিত্তি গরম করা কোরাস :

"বাবুদের বাড়ি চাকরি করে কোন্ শালা…
ছেঁড়া প্যান্তালুন পরে বসতে গেলে
বেরিয়ে পড়ে এঁ্যাড়থোলা…

কিংবা যে জমিদার বাবু নিজের শখের প্রাসাদের নাম দিয়েছিলেন রঙমহল, তার হেনস্থার বিবরণ ঃ

'রঙমহল নগর রসের সাগর
এক এক মেয়ের তিন তিন নাগর
কেউ থাকে দুধে ভাতে
কেউ খায় কাঁজী
হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়ে দাদালি মীরের পাঁজি…
দাদালী মীর বলে, 'কোথা রে ! মোর সমদআলি ভায়া…
সমদালি বেরিয়ে পড়ে বসে পড়ল ভুঁয়ে (মাটিতে)
ঘা-পাঁচ ছয় পড়ে গেল জেমেতালির মুঁয়ে (মুখ)
জেমেতআলির ঘরের পিছে ঝোড়ো-গাছের পাতা
শয়তানিতে ভরা যেন সব বাবুদেরই মাথা…"

বাবুদের বাড়িতে চাকরি করার কত বিপদ। বরাতে ছেঁড়া প্যান্ট জুটবে। লজ্জাস্থান নিয়ে গোপনীয়তা নেই 'পালা'তে। বাবুরা যখন ছেঁড়া প্যান্ট পরতে দিতে পারেন, গানে সেটা যদি বেরিয়েই পড়ে অশ্লীলতা কোথায় ! এটাই স্বাভাবিক ! এতেও রেহাই নেই, বাবুদের মেয়েদের নাগর হতে হবে। ভালো নাগর হলে, দুধে ভাতে থাকতে পারবে, নাহলে কপালে পচাপান্তা আর জুতোর মার… !

তার পরিবর্তে একী ! কিন্তু যাত্রা দলের নামটা কেন 'জয় বাবা তারকনাথ ?'

কে যেন বলে দিল মেয়ে, মদ, মাৎসর্য-ই তো ধর্মের অনুগামিনী। নাহলে মোহ সৃষ্টির এফেক্ট হবে না। ফল মোহ…এরই জন্য, যাত্রার জন্য এত সরকারী সাহায্য ! গ্রামের মানুষের অন্ন কেড়ে নিয়ে, তাঁদের ঘরের পয়সা বার করে আনার কৌশল ! তাঁদেরও ইঁদুর

দৌড়ে ঠেলে দেওয়ার বাতাবরণ তৈরি করা···

ওদিকে ন্যাশানাল সিকিউরিটি সার্ভিস ভিয়েতনাম যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে পৃথিবী জয়ের নীতি নির্ধারণ করেছে—প্রভাবাধীন এলাকা বাড়ানোর জন্য, অন্যের প্রভাবাধীন এলাকায় প্রবেশের জন্য, এবং নিজেদের এলাকা বজায় রাখার জন্য···ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জাতীয়তাবাদকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে হবে ·· মানুষের প্রতিরোধ ভেঙে শর্তাধীন করে তোলার জন্য··· ।

পাঁচশ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার ঋণগ্রস্ত (আভ্যন্তরীণ) আমেরিকার সরকারকে সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের সামরিক বিভাগের রণ-নীতিবিদদের এটাই উপদেশ। সৈন্য, পণ্য এবং অস্ত্র রপ্তানিতে 'বুম' আনার জন্য, এগুলো অবশ্য পালনীয় শর্ত। ওখানে বেশ জাঁক-জমক করেই বিশ্ব-ধর্ম মহাসম্মেলন হচ্ছে।

॥ তিন ॥

একটা ঘর-ভাঙানো-মন-ভোলানো মার্কা গন্ধে সংবিৎ ফিরে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা সুবেশা তরুণী। সুন্দর হয়তো-বা। বিদেশী পারফিউমের গন্ধে ছোট কেবিনটা ভরে গেল। আমাকে তাকাতে দেখেই তরুণী এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন—'দাদা আমাকে চিনতে পারেন···।' এই জগতের লোকদের আমার চেনার কথা নয়। তাই প্রশ্ন-পাঠ উত্তর—'না তো ?' কণ্ঠস্বরে বিস্ময় এবং হতাশা মিশিয়ে তরুণী বললেন । 'মানে আমি উদয়ের '

এবার আকাশ থেকে পড়ার পালা আমার, '···বউ।' তরুণীর চোখ মাটিতে নেমে এল। 'না, মানে···ইয়ে···'।

'তোমাকে এই বেশে চিনবো কী করে বল ? সেই আমাদের বালিকা বধূ এমন নায়িকা হয়ে গেলে চেনা যায় ? তা বোসো···'

এতক্ষণে সঙ্গের যুবকটি মুখ খুললো···'আর আমাকে ?'

চিনতে না পারলেও দুয়ে দুয়ে চারের মত বলে ফেললাম—'তুই তো ছোট্ট পল্টু ! এর ভাই। তোর বাবা-মার ওপর থেকে চাপ কমাবার জন্য এবং মানুষ করে তোলার জন্য ডায়মন্ডহারবার থেকে এখানে এনেছিল···' যুবক একটু থতমত খেয়ে সামলে

নিল। 'দ্যাখ দিদি, আমাকে কিন্তু ঠিক মনে রেখেছেন উনি!' হেসে বললাম 'না, ভাই! তোমাদের কাউকেই মনে রাখিনি···তা তুমিও বসো···জল-টল খেতে হলে ওখান থেকে,' বলে কুঁজোটা দেখিয়ে দিলাম···ওরা দুটো টুল টেনে নিয়ে বসলো। তা তুমি তপতী যে নায়িকা যূথিকাদেবী বোঝা মুশকিল! দাঁড়াও একটু হজম করে নিই ব্যাপারটা'·· বলে ওকে ভালো করে দেখলাম। কচি কলাপাতা রঙের সিল্ক, একই রঙের ব্লাউজ, ছাতাটা পর্যন্ত একই রঙের ওপর ছিট ছিট। মাঝে মাঝে আলো পড়ে কানের পাথরটা আভা ছিটিয়ে নিজের জাত জাহির করে দিচ্ছে, রিমলেস সোনালি ফ্রেমের চশমাও আটকাতে পারছে না প্লাক করা ভ্রূ। নাকের দুপাশে, চোখের দুপাশে অতিরিক্ত চর্বি রিমলেসের রিম হয়ে গেছে। গলায় জমা এক থাক চর্বির মৃদু আভাস—মদ্যপানের অভ্যাসের সাক্ষী। ছেলেটা যেমন হয় তেমনই। জীনস্ বয়। পায়ে একটা ভারী জুতো কাপড়-টাপড়ের হবে বোধ হয়—ফিতেটা গোড়ালির ওপরে বাঁধা। এই আমাদের তপতী আর পল্টু!··· বিস্মৃত এক ঘটনা

॥ চার ॥

বর্তমানের আমি তো সেই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোরই পরিণতি। ঘটে-যাওয়া ঘটনার পরিণতিই তো বর্তমান। ভবিষ্যতের অতীত। একজন মানুষের মানসিক অবস্থার ধারাবাহিকতা। আসলে আমার অভ্যাস আর স্মৃতিরই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক রূপ, এই যে আমি গতকাল ছিলাম, আজও আছি, আজকের আমার কাছে গতকালের আমি স্মর্তব্য কতগুলো ঘটনার স্মৃতি বই তো কিছুই নই। একজন মানুষ কিছু স্মৃতি এবং কিছু অভ্যাস দিয়ে তৈরী। নেচার আর নারচারের সৃষ্টি।

স্মৃতির পর স্মৃতির পাথর জমে জমে তৈরী হয়েছে যে পাহাড়, যে-পাহাড় জীবন্ত, সচল, ভাবতে পারে—সেটাই তো মানুষ!

অন্ধকার কিছু গুহা তৈরী হয়েছে সেখানে। তার মধ্যে শ্বাপদের আনাগোনা। নিচের পাথরগুলো আর দৃশ্যমান নয়। সকলে আলো ঝলমল চূড়াটাই দেখে। তাই আমার আমিটাই

বিস্মৃত। কিন্তু পাহাড় কি করে ভুলবে যে-আলো-ঝলমল সাদা চূড়াটা দেখে সকলে তাকিয়ে থাকে, তারিফ করে কিংবা অবজ্ঞা, সেটা দাঁড়িয়ে আছে ঐ বিস্মৃতির ওপর! কত ছোট ছোট ব্যথা বেদনা তার তলায় চাপা পড়ে আছে কে তার হিসেব কষে!

'ঝিনুক নিজের ক্ষত ঢাকার জন্যই এক ধরনের লালা তৈরী করে। জহুরী সেই জমাট বাঁধা লালটাকেই চেনে। মুক্তোর কারবারীদের কাছে ঝিনুকের ক্ষতের কী মূল্য আছে বলো?' তপতীর মানে যূথিকার আঙুলে ধারণকরা মুক্তোটার দিকে তাকিয়ে বললাম—'উদয় তো এখানেই ভর্তি আছে রাক্ষস রোগে ধরেছে, দেখা হয়েছে?'

তপতীর মাথা নিচু হয়ে গেল। পল্টু ফোঁস করে উঠল—'দেখা করে কী করবে? ও কি ডাক্তার, না, নার্স! ওনার টাকা আছে চিকিৎসা করাবে?' পল্টুর কথা শুনে অবাক হলাম। বললাম 'না, নেই। সেগুলোও তুমি এবং তোমার দিদি সব সরিয়েছ। এই যে জড়োয়ার গয়না এগুলো সবই ওর। ওঁর দোকানটাও জামাইবাবু বেদখল করে নিয়েছে,…তার ওপর···যদি তা বলো তো কী মনে করে এসেছিলে?'

পল্টু একটা সিগারেট বার করে বললো—'স্যার খেতে পারি?' অবাক হয়ে গেলাম। আট বছরের পল্টু আর ওর দিদিকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর।···'আমি স্যার মডার্ন ম্যান…খাও-পিও-জিও ··ও সব নেই বাবা আমার'—অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাঁধ এবং ভ্রূটা নাচালো। গা জ্বলা করছে। 'তা খাও। কিন্তু যাত্রাদলে তুমি কী সাজো? তামাক না গাঁজা! না কি দিদির বডিগার্ড।'

পল্টু ওর দিদির দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো—'কী রে, চলবে না কি?'

তপতী রেগে ওর দিকে চোখ পাকালো। যূথিকা তাহলে সিগারেটও খায়। তামাক পোড়ার চেনা গন্ধে গা-টা গুলিয়ে ওঠে। অত্যন্ত পরিচিত গন্ধ। পল্টুর দিকে তাকিয়ে বললাম—'পল্টু, গাঁজাটা বাইরে গিয়ে খেয়ে এসো! এটা হাসপাতাল কেবিন!' তা হলে যূথিকাদেবী ভাইটাকেই ভেড়ুয়া বানিয়েছেন!

কী মানুষই হল ! 'তা কী মনে করে ?...'

'দাদা একটা জরুরি কাজে এসেছি। আপনার সঙ্গে তো সোনেক্স-এর মালিক জোছনদার আলাপ আছে ?'

'আছে—মানে ছিলো। কিন্তু কেন ?'

'আমাকে টি-ভি-তে একটা চান্স করে দিতে হবে !'

অবাক হলাম—'কেন ! এখন তো যাত্রাতে প্রচুর পয়সা ?'

'না, পয়সার জন্য নয়। আমার একটু প্রচার চাই। শিপ্রা কিছু অভিনয় করতে পারে না। লোকে ওকে দেখবার জন্য হুড়ো-হুড়ি করে। এই দেখুন না আমি এখানে এলাম কেউ চিনতেই পারলো না—শুধু ঐ পুলিশ অফিসারটা...'

'হুম !' বলে চুপ করে রইলাম।

'ওরা যদি টাকা চান, যদি...মানে যে রকম বলবেন...মানে আমি তো ওই ব্রেক ড্যান্সটাও জানি মানে বলবেন, শ্রীদেবীকেও হারিয়ে দোবো... আমাদের পালার মালিক, ডিরেক্টর ঐ ছুঁড়িকে নিয়ে বড্ড বেশী মাতামাতি করছে...'

অবাকের পর অবাক ! এই আমাদের বালিকা-বধূ তপতী। গ্রামের ব্যবসায়ী কাম ধনী কৃষকের ছেলে উদয়। পড়তে এল কলকাতার এক নামী কলেজে। মাথা ভর্তি কোঁকড়াচুল। তেল চক চকে তামাটে রঙ, একটু আধো-আধো কথা বলে, কিন্তু ঠিক তোতলা বলা চলে না। গায়ে মাটির গন্ধ। এই সমস্ত কলেজে যা হয় তাই হলো।

গ্রামের ধনী ঘরের ভালো রেজল্ট করা ছাত্রদের, শহরের অভিজাত ভালো ছাত্ররা অবজ্ঞা করতো। মাস্টারমশায় থেকে দরওয়ান পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই ফারাকটা বুঝতো এবং সচেতন ভাবে লালনও করতো। অনেকটা সিডিউলড্ কাস্ট ঘরের কিংবা নমিনেটেড আই. পি. এস.-দের মত অবস্থা। আমি একজন নকশাল নিধনকারী নমিনেটেড আই-পি-এস-কে জানতাম, খুন করার জন্য তাকে বাংলার সকলেই চেনেন। সেই ভদ্রলোক এত করেও I. P. S.-দের পার্টিতে কিংবা বার্ষিক সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ পান নি কোনদিনও। গ্রাম থেকে আসা এই সমস্ত বুদ্ধিমান ছেলেদেরও অবস্থা সেই রকম। এমনকি সরকারি

হস্টেলের ঠাকুর—বেয়ারারাও এটা বুঝতে পারতো। তাদের সঙ্গে এদের ব্যবহার ছিল রীতিমত অবজ্ঞার। অভিজাত কলেজ-গুলোতে 'নকশালী প্রভাব' নিয়ে যারা মাথার চুল ছিঁড়ছেন তারা এই দিকটা ভাবলে চিন্তার একটা নতুন খোরাক পেলেও পেতে পারেন।

গ্রাম-থেকে আসা বুদ্ধিমান ছেলেদের ইজ্জতে ঘা লাগাটা স্বাভাবিক। তাঁরা ফুঁসছিলেন। সামনে এসে গেল ৬৫ সালের খাদ্য আন্দোলন। নুরুলের জীবনদান কাঁপিয়ে দিচ্ছে শহর। সব বড় বড় কলেজের ছাত্ররা রাস্তায়। খুনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা হেস্তনেস্তা করতে তাঁরা ক্লাসরুম ছেড়ে নেমেছেন রাস্তায়। অভিজাত কলেজের এই সমস্ত ছাত্ররাও নিজেদের দূরে রাখতে পারলেন না। শহরের অভিজাত বংশোদ্ভবদের ওপর তার প্রভাব পড়লো। বিভিন্ন সংগ্রামের এঁরা হয়ে গেলেন নেতা। অটোমেটিক চয়েস। অবজ্ঞার জায়গা নিল মান্যকরা বা সমীহ-করা।

আমাদের উদয় ব্যানার্জিও হল কলেজ-কাঁপান নাম। পারি-বারিক প্রতিবন্ধকতা তার বুদ্ধি এবং সাহসের কাছে হার মানলো। যে-সব মাস্তানরা রাস্তাঘাটে কলেজের মেয়েদের পেছনে লাগতো তাদের আতঙ্ক হয়ে উঠলো সে ধীরে ধীরে…

খাদ্য আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোকে গলাটিপে হত্যা করলেন সদ্যমুক্ত নেতারা। কিন্তু এই ছেলেগুলোর নেতৃত্বকে হত্যা করতে পারলেন না। কলেজে কলেজে বিদ্রোহী ছেলেদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। স্বাভাবিক ভাবেই উদয় চলে এলো নেতৃত্বে ··

॥ পাঁচ ॥

বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন উদয় ঘোষণা করলো—'বিয়ে করেছি! তোমাকে যেতে হবে'। একটু অবাক হলাম, ভাবলাম গ্রামের ছেলে, অল্প বয়সে বিয়ে দেবার শিকার হয়েছে, জিগ্যেস করলাম—'কী ব্যাপার ?' ও যা বললো—তার নির্গলিতার্থ কন্যাদায়গ্রস্ত এক পিতার লগ্নভ্রষ্টাকন্যা উদ্ধারের গল্প। বুঝলাম কলেজের 'হিরো', গ্রামেও 'হিরো' হয়ে গেছে।

ওর বাড়িতে গিয়েই প্রথমে তপতীকে দেখি, ক্লাস টেনে পড়ে। এক গা গয়না পরেও দারিদ্র্যের ছাপ এড়াতে পারেনি চোখ মুখ থেকে, হেসে বললাম 'এ যে বালিকা বধূ!' ওখানে বসেই শুনলাম ওর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা। পাঁচ মেয়ের বড় এটি। ছোট একটাই ভাই। উদয়, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে লেখাপড়া শেখাবে, ক্লাস সিক্সে পড়ে।...

দিন যায়, মাস যায়, বছরও ঘুরে যায়। আমরা ছিটকে এখানে-সেখানে। কলকাতাতে চলছে পুলিশ মিলিটারি তান্ডব, কোন খোঁজ নেওয়া হয়নি উদয়ের। এবারে গ্রেপ্তারের কয়েকদিন আগে হঠাৎ রাস্তায় দেখা। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরিচয় না দিলে চিনতেও পারতাম না। জোর করে টেনে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। ওকে দেখে যত-না চমকেছিলাম—ওর ঘর দেখে আরও চমকে গেলাম। পুরানো কড়ি বরগার বাড়ি। ছাদ থেকে বরগা-গুলো আলগা হয়ে গেছে। টালিগুলো বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে, ঘরের সেই অফ-হোয়াইট পালিশ উধাও। কড়ির গর্তে চড়ুই-পায়রারা আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিজেদের ঘর বাঁধতে গিয়ে আশ্রয়দাতার ঘরকে খড়কুটো দিয়ে যথেচ্ছ নোংরা করছে। এখানে-ওখানে ঝুল। এ ঘরে কোন লোক থাকে বলে সহজে মনে হয় না।

ড্রেসিং টেবিল, পালঙ্ক সব উধাও এক কোণে একটা লোহার খাটে একটা বিছানা। ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আমি 'হাঁ' করে দেখছি···উদয় বিছানাটা একটু হাত দিয়ে ঝেড়ে নিলো। 'বোসো সব বলছি···'

উদয়ের কথা

না, তপতী নেই, নেই শুধু নয় সে সব নিয়ে গেছে · গ্রামের মেয়ে আলোর হাতছানিতে হতভম্ব ··যা দেখে তাতেই অবাক, ওদিকে পল্টু বাবাজি হায়ার সেকেন্ডারিতে ফেল করলো··· আমি কলেজ-কফি হাউস-পাড়া নিয়ে ব্যস্ত। তোমরা সবাই চলে গেছ। কলকাতাতে চলছে ভূতের নেত্য, পার্টির নাম করে একদল ছেলে এমন সব কীর্তি-কান্ড করতে শুরু করলো সাধারণ

মানুষ বিভ্রান্ত। আমরা যারা পার্টি মানে একটা আদর্শ, একটা জীবন দর্শন বুঝতাম আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম, কে যে কাকে কখন খুন করবে বোঝা মুশকিল। একটা আতঙ্ক···। কোন বাড়িতে ঢুকতে পারি না।··· এর মধ্যেই মাঝে মাঝে মিলিটারি কম্বিং।

ভাবলাম কিছুদিন গ্রামে চলে যাই, বাবা অনেক দিন ধরে খবর পাঠাচ্ছেন তাঁর রাগ পড়েছে, যেন দেখা করি। তপতীকে বললাম সে কথা, ও যেতে রাজি হল না কারণ পল্টু যেতে চাচ্ছে না। বললো—'আমাদের কোন ভয় নেই। গতকাল দুপুরেই তো প্রাণদাকে নিয়ে এসেছিলো' ···ওর কথা শেষ করতে না-দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম ·· 'কী বললে? প্রাণদা? কোন প্রাণদা···'

'এপাড়ায় আবার ক'টা প্রাণদা আছে?'··· ওর পাল্টা প্রশ্ন। কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকলাম। তারপর আস্তে আস্তে ওকে বললাম—'তুমি জানো লোকটা কে? এ পাড়াতেই ও অন্তত পক্ষে আমাদের সাতজন ছেলেকে খুন করেছে—ডজন খানেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে····কম করে তিরিশটা ছেলে এখনও ওর কল্যাণে জেলে পচছে····', 'থামো তো তুমি! তোমরা যেন ধোয়া তুলসী পাতা তারা কেন নিরীহ পুলিশ মারতে গেল? ওদের পেছনে লাগতে গেল···ওদের ক্লাব বন্ধ করে দিলো?···' তপতীর পাল্টা যুক্তি। বিস্ময়ের পর বিস্ময়! তপতীর মুখে এত কথা! যে মেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকতো, স্বামীর আদরেও পোষা মেনীর মত ঘড় ঘড় শব্দ ছাড়া একটা অভিব্যক্তিও শুনিনি সেই কিনা এসব বলছে···চিৎকার করে উঠলাম···'কী যা তা বলছো তপতী? কোন পুলিশটা নিরীহ আমাকে বলো তো? তুমি জানো এই পাড়াতে যে কনেস্টবলটা খুন হয়েছে তার আসল পরিচয়? যে-ছেলেরা ওকে কাকাবাবু বলতো···ওকে বিশ্বাস করতো তাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে····চলো তাহলে সেদিনের কথাটাই বলি···'

"পাড়ায় পাড়ায় মিলিটারি কম্বিং শুরু হয়েছে, মিলিটারি আর পুলিশকে সামনে রেখে সিদ্ধার্থ-প্রাণদের গুন্ডারা বাড়ি বাড়ি ঢুকে লুঠতরাজ ধর্ষণ কী না করছে! বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—কোন বাড়ি ঢুকতে পারছে না, খেতে পায় না, প্রচন্ড শীতে একটা গায়ে দেবার মত চাদরও নেই। চান নেই, খাওয়া নেই, চুলকানি, খোস পাঁচড়াতে গা ভর্তি। পার্টির ভারপ্রাপ্ত নেতা যিনি 'নো অ্যাকশন, নো পার্টি' তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তার পাত্তা নেই। একদিন দেখি শঙ্কর! শঙ্কর দে, চেনো তো? ঐ যে ফুটফুটে ছেলেটা হায়ার সেকেন্ডারিতে থার্ড হয়েছিল, রাজাবাজারের একটা হোটেল থেকে খেয়ে বেরুচ্ছে। আমি চিনতেই পারিনি; ওই এসে পরিচয় দিলো। জড়িয়ে ধরলাম, চোখেমুখে কালির ছাপ। বুঝলাম কতদিন ঘুমোয় নি ও, সদ্য-ওঠা দাড়ি-গোঁফ খোঁচা খোঁচা, ওর হাতটা চেপে ধরতেই দেখি যন্ত্রণায় মুখটা কুঁকড়ে গেল, সেটা উল্টে কী দেখলাম জানো? আঙুল ভর্তি ঘা, পাঁচড়া। ছেঁড়া একটা বুশশার্ট গায়ে। সেটা যে ওর নয় বুঝতে পারলাম, প্যান্টের অবস্থা আরও খারাপ, শতচ্ছিন্ন··· বললাম, 'শঙ্কর, বাড়িতে যোগাযোগ নেই!' ও বললো, 'না উদয়দা, সেখানে ঢুকতে পারছিনা, প্রাণদের লোক প্রতিদিন বাড়িতে এসে শাসিয়ে যাচ্ছে। বোনকে কিড্‌ন্যাপ করার হুমকি দিয়েছে··· নেহাৎ বাবা বড় ডাক্তার বলে বাড়িটা ভাঙেনি—তবে বাবাকে ওদের চিকিৎসা করতে হয়—ওদের অ্যাকশন করে ইনজ্যুরি হলে বাবাকে নার্সিং হোমে রাখতে হয়—বাড়িতে জোর করে থাকে, মাসকাবারি নেয়—'

শঙ্করের চোখ দুটো জ্বলতে থাকে, জলে নয়···আগুনে···। চলতে চলতেই কথা হচ্ছিল। সে একটু গলাটা স্বাভাবিক করে বললো, 'বুঝলে উদয়দা, বাবার জন্য কষ্ট হয়। সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে যে লোকটা সার্জন-সুপারিণ্টেন্ডেটের চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল···আজ আমার জন্য, বোনের নিরাপত্তার অভাব··· তাকে বাঁচাতে কতগুলো রেপিস্ট্ গুন্ডার কাছে সারেন্ডার করে গেল?···" স্পষ্ট হতাশার সুর।

ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, 'শঙ্কর তুমি জানতে না এসব হবে? ভালবাসবে অথচ মূল্য দেবে না এতো হয় না? তোমরা বিপ্লবকে ভালবেসেছ, দেশকে ভালবেসেছ সাম্রাজ্যবাদ তার মূল্য নিঙড়ে নেবে না? সব ভালবাসাই তো মূল্য নিঙড়ে নেয়…'

"জানতাম উদয়দা, কিন্তু এমন কুকুর-বেড়ালের মত মরতে হবে জানতাম না…লোকনাথ ঘোষ এলাকার দায়িত্বে এসেই সর্বনাশ করলো, নিজে থাকে বালিগঞ্জের এক হীরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে। বড় বড় কথা বলে সব কটা ছেলেকে খুন করালো।…আচ্ছা উদয়দা বলুনতো আমাদের তো গ্রামে পাঠিয়ে দেবার কথা'…চুপ করে করে শুনলাম ওর অভিযোগ, বললাম—'আমি তো সামান্য পত্র-বাহক দূত! তোমাদের নেতারা কী বলেন?'

'বলেন, নিজস্ব উদ্যোগের পার্টি নিজে খুঁজে চলে যাও!'

বলেন, 'সমস্যা দেখলে যে অন্যের কাছে ছুটে যায় যে ভালো কমিউনিস্ট নয়।"

পরিপ্রেক্ষিতবিহীন ভাবে যত্রতত্র উদ্ধৃতি ব্যবহারের বিপদটা বুঝলাম। সাধারণ কর্মীদের উদ্যোগ এবং আগ্রহ বাড়ানোর জন্য যে কথাটা বলা হয়েছিলো—নিজেদের পরিশ্রম আর পিঠের চামড়া বাঁচানোর জন্য হাফ নেতারা সেগুলি যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে, এদের এক পকেটে বিপ্লবী বুলি অন্য পকেটে সুবিধা-বাদ, যখন যেটা দরকার প্রয়োগ করে।

চলতে চলতে শঙ্কর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখে, রাস্তা ফাঁকা। রাত নটার সময় কলকাতার একটা প্রধান রাস্তা বোঝাই যায় না। বে-ওয়ারিশ কুকুর, ধম্মের ষাঁড় এবং পুলিশের গাড়ি ছাড়া প্রাণের চিহ্নও নেই।

'আমার শেলটারে যাবে নাকি?' হো হো করে পাগলের মত হাসতে শুরু করলো শঙ্কর। হতভম্ব হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখি এখানে কোন বাড়ি ঘরের চিহ্ন নেই। 'এখানে কোন বাড়িতে? সায়েন্স কলেজে না কি?'

'না, না, ওখানে কেন? ঐ যে…' ওর আঙুল বরাবর চোখটা তুলে দেখি একটা ঢালাই-করা মোটা পাইপ রাস্তা মেরামতের জন্য

রাখা আছে'...তুমি, তুমি ওখানে থাকো ?' আমার পা নড়ছে না, ভাবছি কলকাতার এক নম্বর অ্যানাসথেসেরিস্ট ডাক্তার বি-বি মুখোপাধ্যায়র কৃতী সন্তান ! একী ত্যাগ ! চোখের কোনটা করকর করছে ; কোন রকমে নিজেকে সামলে ওর হাতটা চেপে ধরলাম—'শঙ্কর ! আজ তোমাকে আর ওখানে যেতে দোবো না. তুমি আমার বাড়ি চলো !' ম্লান হাসি হাসলো সে, 'তা হয় না উদয়দা, আপনি সি-সি-র ক্যুরিয়র আপনার বাড়িতে ঢুকতে কেউ দেখলে আপনি এক্সপোজ হয়ে যাবেন ! পার্টির সর্বনাশ হবে !'

'দিনের বেলা কোথা থাকো ?' অন্যায় এবং বে-আইনী প্রশ্নের জবাব দেবে কী দেবে না ভেবে শঙ্কর বললো, 'শুনবেন ? ট্রেনে রাত থাকতে থাকতেই একডজন কুকুরের ঘুম ভাঙিয়ে হাটতে থাকি, শেয়ালদা স্টেশনে সব চেয়ে আগে যে ট্রেনটা ছাড়ে তাতে চেপে বসি। সারাদিন কোন একটা মফস্বল স্টেশনে কাটিয়ে ডাউন ট্রেনে ফিরে আসি...ফিরে রোজ আসতেই হয়...নর্থ ইস্টের সব কমরেডরা ছিটকে গেছে...তাদের খোঁজ করি...আবার সংগঠিত হতে হবে...এরকম ভাবে হারা চলবে না। আর হারার বিলাসিতা আমাদের মানায় না উদয়দা ! এমনিতেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে...' ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি না, গলার স্বরেই ফুটে উঠছে দু-চোখের স্বপ্ন ! মাথাটা নীচু হয়ে গেল। 'চলি উদয়দা !...' ওকে বাধা দিলাম—'একটা কথা দাও ! কাল সন্ধ্যে বেলা ঐ দোকানে আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমার দেশের বাড়ি তোমাকে রেখে আসবো...'

'একী উদয়দা ? আপনি কাঁদছেন !'

'না, না, কাল আসছো তো ?'

'আচ্ছা !' বলে শঙ্কর গুন গুন করে গান করতে করতে এগিয়ে গেল... 'মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি সেদিন সুদূর নয় আর।

'দেখ লাল সূর্যের আলোয় লাল
পূর্ব দিগন্তের পার '

রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাথ ধরার জন্য পা বাড়ালাম...পা

নড়ে না। আবার একবার পেছনে ফিরে দেখলাম···না, ওকে দেখা যাচ্ছে না। পা-টা ফুটপাথে ফেলতেই ভুত দেখার মত চমকে উঠলাম···'একী এই লোকটা কোথায় ছিলো! পাড়ার এই পুলিশ কনেস্টবলটা!'

'কার সঙ্গে কথা বলছিলেন উদয়বাবু!' ওর জিজ্ঞাসার উত্তরে খুব স্মার্টলি বললাম—"আবগারি রেইডে গিয়েছিলেন না কী?'

'লোকটা কেমন হকচকিয়ে গেল! কী করে জানলেন?'

'ব্যাগের ভেতর থেকে বোতলগুলো যে উঁকি মারছে!'

'হেঁ হেঁ এই প্রাণদা···' বলেই জীব কেটে 'না, মানে পাড়ার ছেলেরা আজ ধাঙড় বস্তিতে ফিস্ট করবে তো? আমাকে বললো 'কাকাবাবু আপনি থাকতে নিরামিষ হবে?—তাই—গাড়িটা নামিয়ে দিয়ে গেল; দেখলাম আপনারা দুজন আছেন?'

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। গলাটা স্বাভাবিক করে বললাম, "আপনি ঐ তরলের প্রভাবে দু-জন দেখেছেন!···

'তাই হবে!···' বলে সে পা বাড়ালো, কিছুক্ষণ পিছনের দিকে না তাকিয়ে রাস্তাটা ধরে একই দিকে হাঁটতে থাকি। শঙ্করের আশ্রয় স্থল পাইপটার কাছাকাছি এসে রাস্তাটা ক্রস করে একটা গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। কী করা উচিত ভাবছি। ওপারে গিয়ে শঙ্করকে ডেকে দোবো? কাকাবাবু কী এতখানি নীচে নামবে? এই ছেলেরাই তো পাড়ার লোক বলে ওকে কয়েকবার বাঁচিয়েছে শুধু নয়, নিজেরা স্কোয়াড করে পাহারা দিয়েছে। ওর কী একবারও মনে পড়বে না সেই সব কথা? ও কি দেখেছে শঙ্কর কোথায় গেল? নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছি। কেন শঙ্করকে আটকে দিলাম?

এমন সময় মনে হল কয়েকটা কালোমূর্তি লেডিজ পার্কের রেলিঙ টপকে রাস্তায় নামছে। বুঝতে বাকী রইলো না ওরা কারা? ওরা সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে মেরে এগুচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত মনে হচ্ছে এক একটা দিন! নিজের বুকের শব্দ চাপার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রেখেছি। হাঁক দিলে কী শঙ্কর শুনতে পাবে?'

হঠাৎ চারপাশটা আলোয়-আলোময়—পাঁচ ছটা মশাল একসাথে জ্বলে উঠে এলাকাটার অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। একটা পাইপের ভেতর থেকে একটা জ্বলন্ত আগুনের মূর্তি ছিটকে বেরিয়ে এল…

তার পেছনে পেছনে ছুটছে পাঁচ ছ'জন লোক উন্মত্ত চিৎকার করতে করতে। জ্বলন্ত মূর্তিটা রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে একটা চিৎকার করে পড়ে গেল—পাঁচ ছটা জ্বলন্ত মশাল নিক্ষিপ্ত হল তার দিকে। সেই আলোতে দেখলাম 'কাকাবাবু আর প্রাণকে…'

চোখ ঢেকে বসে পড়লাম গাছটার নিচে। জ্বলতে লাগলো একটা দেহ, একটা কিশোর…জ্বলে গেল মুক্তভারত…শোষণ মুক্ত ভারত! কতক্ষণ বসেছিলাম জানিনা…তীব্র মানুষ পোড়াগন্ধ আর রাস্তার কুকুরদের চিৎকারে সংবিৎ ফিরে এল…'

উদয়ের কথা

'বুঝলে তপতী! এই তোমাদের নিরীহ পুলিশ! এই তোমার প্রাণদা! আজও ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করছিলেন, 'উদয় শংকর কোথায় জানো? বলতে পারলাম না।…'তপতী পল্টুকে বাঁচাও দিদি হয়ে তুমি ওর এই সর্বনাশ হতে দিও না…।"

'প্রাণ এবং তার ছেলেদের এখানে ঢুকতে দিও না—আজও ঐ রাস্তায় চলতে চলতে শুনতে পাই সেই সুর— "সেই আলোভরা দিন আনতে হবে/ঢালো কমরেড সব রক্ত তোমার…" সেই গাছের তলায় আজও শংকর আসে…শংকর সব দেখছে তপতী! প্রাণকে আমার বাড়ি ঢুকতে দিও না…'

তপতী শুনলো না, বললো, কী জানো? 'সে সব যা হবার হয়ে গেছে। প্রাণদা বলেছেন পল্টুর একটা ব্যবস্থা করে দেবে…. পল্টু কি চিরকাল জামাইবাবুর চাকর হয়ে থাকবে না কি! বাবা বুড়ো হচ্ছেন…বোনগুলোকে বিয়ে দিতে হবে না…?'

'ওঃ তাই? তা ও তো আমাদের দোকানটা নিয়ে নাড়চাড়া করে খেতে পারে…' আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি কোথা থেকে পল্টু এসে হাজির… 'ও সু-সব নাড়াচাড়া করে কারও অধীনে আমি থাকতে পারবো না…সে…সে আমাকে লিখে দিতে

হবে!' পল্টুর দিকে সোজা তাকালাম, অনেক দিন ওকে লক্ষ করি নি···তা, সেই ছোট পল্টু আর নেই, মুখের সেই সরল ভাবটাই নষ্ট হয়ে গেছে···গ্রামের এত দারিদ্র্যও ওর চোখ মুখ থেকে যে নিষ্পাপ সরলতাটা কেড়ে নিতে পারে নি কলকাতা সেটা কেড়ে নিয়েছে, চোখে মুখে কী রকম একটা কঠিন রুক্ষ ভাব, একটা তোয়ালে গেঞ্জি পরেছে, সাথে নীল রঙের জীন্‌সের প্যাণ্ট, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে লম্বা চুল। ঘন ঘন চুল বাগাতেই ব্যস্ত, ডান হাতে একটা স্টীলের বালা, বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি···আংটি ····গলায় একটা সোনার চেইন···। ওকে যত দেখছি অবাক হচ্ছি··· এই সেই পল্টু···। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো 'বাঃ প্রাণেরই চেলা বটে····' 'দেখেন জামাইবাবু! প্রাণদাকে কিস্সু বলবেন না···আমি আমি সহ্য করবো না···সে আমার বাবার মতো···" মুখ দিয়ে ভস্‌ ভস্‌ করে গাঁজার গন্ধ বেরুচ্ছে, চিউইং গাম না কী যেন একটা চিবুচ্ছে···তাতেও গাঁজার গন্ধ ঢাকা পড়ছে না। 'আপনি আমার কী করেছেন! আমার ভবিষ্যৎ আমাকেই গড়তে হবে···' 'হুম্‌' বলে রাগটা হজম করে তপতীর দিকে তাকালাম, আমার এ চাউনির সঙ্গে তপতী বিলক্ষণ পরিচিত। সে মধ্যস্থতা করার সুরে বললো—'তা ওকে দোকানটা লিখেই দাও না।' আবার একবার তাকালাম তপতীর দিকে···চোখটা নামিয়ে নিয়ে সে বললো···'না হলে দোকানটা তো তুমি রাখতে পারবে না···'

সেটা বিলক্ষণ জানি, ইতিমধ্যেই দোকানের ম্যানেজার কাকাবাবু, সেটা জানিয়ে গেছে 'ছোটবাবু, প্রতিদিন দোকানে এসে ক্যাশ থেকে মুঠো মুঠো টাকা সরাচ্ছে।' একদিন বাধা দিতে গিয়ে ম্যানেজার লাঞ্ছিত হয়েছে। স্বয়ং প্রাণ এসে মিষ্টি মিষ্টি করে হুমকি দিয়ে গেছে।

'পল্টু বলছিলো প্রাণদা নাকি বলেছে দোকানটা তো চলছে না, তুই ওটা নিয়ে ওখানে একটা বার-কাম রেস্টুরেন্ট কর না! দারুণ, তা পল্টু যদি চালাতে পারে—ওরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে, জায়গাটাও হাতে থাকবে···' তপতীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। বলে কী মেয়েটা! ও এত সব কথা শিখলো কবে? পল্টু তখন তার দিদির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের কেয়ারী করছে,

আয়নার ভেতর দিয়েই সব দেখছে, কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝে নিয়ে শেষ চেষ্টা করলাম…'ঠিক আছে তাই হবে। তবে পল্টুকে কথা দিতে হবে পুরানো কর্মচারীদের একজনকেও তাড়াবে না আর… ওই প্রাণের লোকদের সঙ্গে ও আর মিশবে না ।'

পল্টু এবং তপতীর মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে গেল, ওদের মুখের সেই উজ্জ্বল আভায় আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। সেই আলোতে আমি দেখলাম ওদের চোখ দিয়ে লালা ঝরছে, চোখ বন্ধ করে নিলাম। এ কী ভয়ঙ্কর চোখ, মুখ। 'কবে রেজিস্ট্রারি করবেন জামাইবাবু?' পল্টুর প্রশ্নের জবাবে চোখ খুললাম, মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। 'ওরা কী চায়?' ভাববার আর অবকাশ নেই। এখন সমস্যা ওদের পাল্টাতে হবে, মনে হচ্ছে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। বললাম…যে দিন তুমি বন্দোবস্ত করতে পারবে সেই দিন-ই…' নীচে নেমে গেলাম।

কয়েকদিন পরেই দোকানের মালিকানা পল্টুর নামে লিখে দিলাম। এরপর একদিন রাত্রে ম্যানেজার কাকা আর আমাদের তিনপুরুষের…কর্মচারিরা…এসে বললেন…'উদয়দা! আমাদের নিষ্কৃতি দ্যান। পল্টুবাবুর চাকরি আমরা করতে পারবো না', জানতাম এটা হবে, তবু জুয়োখেলা, ম্যানেজার-কাকার চোখ ছল ছল করছে, ষাট বছরের বৃদ্ধ, কোথায় যাবে? বললাম… 'কয়েকদিন সময় দাও, তোমাদের তো কোথাও কিছু করতে হবে, খাবে কি? সংসারের অতগুলো লোক তো মরে যাবে?''

'সে যা হয় হবে! কপাল? সব আমাদের কপাল?…' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম— 'কাকা, আমি খেতে পেলে, তোমরাও খেতে পাবে…তোমাদের ছেলেমেয়েরাও খেতে পাবে…কয়েকদিন সময় দাও!' ওঁরা চলে গেলেন।

পল্টুর সঙ্গে দেখা করলাম সেইদিনই। ওকে বললাম 'আমাদের কর্মচারিদের তাড়াবে না এটাই তো শর্ত ছিল…' আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে পল্টু হা, হা করে উপহাসের একটা হাসি হাসলো…"আপনার মাথা খারাপ, না, পেট খারাপ…' চমকে উঠলাম, 'কী বললি? আবার একবার বল শুনি…' ব্যাপারটা বড্ড

বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে বুঝে ও চুপ করে গেল, তারপর বললো···
'জামাইবাবু! ওই সব দোখনো গাঁইয়াদের দিয়ে কী করে এর কাজ হয়? বলুন?' তপতীর দিকে তাকিয়ে এবার আমি হাসলাম হো, হো করে, 'শোন তপতী তোমার, সোদোর ভাই কী বলেন শোন, ম্যানেজার কাকা দোখ্‌নো গাঁইয়া, আর উনি শহুরে অভিজাত!···হাঃ হাঃ হাঃ · '

'তা ও কী ভুল বলেছে শুনি?'···তপতী ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

'না, না, ভুল বলবে কেন? খুউব সঠিক বলেছে'—আমার গলায় তীব্র ব্যঙ্গ।

'আমার শুধু তোমার বাবার মুখটা মনে পড়ছে···একটা বানিপোতার গামছা কোঁছা দিয়ে পরে পরের জমিতে কোদাল চালাচ্ছেন—তোমার মা পুকুরের পাড়ে হাঁটুর ওপর কাপড়টা তুলে কলমি শাক তুলছেন তোমার বোনদের খাওয়াবে বলে। কুঁড়ে ঘরের চালের খড় বেয়ে কেন্নো নামছে···ফাঁকা উঠানে মাটির সানকী, কয়েকটা উনুনের পাড়ে উপুড় করে গরম করতে দেওয়া আছে—তোমরা দোখ্‌নো হতে পারো?—ছিঃ ছিঃ! তোমরা কলকেত্তের বাবু···পরের পয়সায় ফোতো লবাব! বাবু তো হতে পারবে না ···আড়কাঠি ভেঁড়ুয়া—!' আমার কথা শেষ হবার আগেই পল্টু চিৎকার করে ওঠে—'আপনি আমাদের বংশ তুলে গালাগালি করছেন? খাবার খোঁটা দিচ্ছেন?···দিদি চল্‌! আখুনী চল্‌!···' সে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল, ভাই-এর জায়গা নিলো দিদি, সে চিৎকার করে, "আমার বাবা কি কাউকে পায়ে ধরে সেধেছিলো? ধান্দাবাজ লোক একটা!····'

হাসলাম, 'তা বটে! মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা! শিবনাথ চক্রবর্তীর মেয়ের বিয়েতে মণ্ডলঘাটের বরযাত্রীরা ঝামেলা করছে বরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে···কারণ সোনার গয়নার জায়গায় গিল্টি করা গয়না দিয়েছিলো শিবনাথ,···তোমার বাবা, মানে শিবনাথ চক্রবর্তী পাগলের মত ছুটে এসে পড়লেন···না, না, পায়ে কেন? হাতটা চেপে ধরলেন···।

'গেলাম তোমাদের বাড়ি। তুমি ঘন ঘন ফিট হয়ে যাচ্ছ! বাইরে তাণ্ডব, বর গরুর গাড়িতে উঠে গেছে—সাজানো বিয়ের উপাচার

নিয়ে—পুরুত বসে আছেন…লগ্ন যায় যায়…হঠাৎ সিনেমা-গল্পের নায়ক হয়ে গেলাম…'

'ওঃ উনি ভারী কাজ করেছেন!' তপতী চিৎকার করে ওঠে। 'আসলে আমাকে দেখেই ধান্দা মাথায় চেপে যায়…উনি না উদ্ধার করলে আর চলতো না আমাদের—', হঠাৎ বাধা পেয়ে তপতীর কথা থেমে যায়…কয়েকজন লোক দুড়দ্দাম করে পালঙ্কটা খুলতে শুরু করে—সেগুলো নীচে নিয়ে যাচ্ছে—ড্রেসিং টেবিলটা ওঠায়—একপাশে বসে আমি হাসতে হাসতে সব দেখছি।

'দিদি! তোর কি দিবি দিয়ে দে। ছেলেরা লরি ছেড়ে দেবে।' পল্টু তাড়া লাগালো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে সব আমি তো জানতাম-ই প্রবীরদা আগেই বলেছিল…উদয় তো তোমাকে করুণা করেছে, ওখান থেকে তোমাকে চলে আসতেই হবে, তাই সব গুছিয়েই রেখেছিলাম—শুধু দিনের অপেক্ষা—' তপতীর কথাতে মাথা ঘুরে গেল, প্রবীরদা? মানে আমাদের ছাত্র-জীবনের আদর্শ… প্রবীরদা-প্রাণ এক সঙ্গে? সেখানে তপতী?

'কী প্রবীরদার নাম শুনে অবাক হচ্ছো?…' তপতীর শ্লেষের জবাবে বললাম—'না, কিছুতেই অবাক হচ্ছি না, মেলাচ্ছি।'

'মেলাবার কিছুই নেই! এ পাড়াতে থাকতে গেলে প্রাণদাকে হাতে রাখতেই হবে। প্রবীরদা চালাক মানুষ—প্রাণদাকে বাগিয়ে, …টি-ভি সিরিয়লের দু-তিনটে বাগিয়ে নিয়েছে, প্রবীরদার বুদ্ধি, প্রাণদার শক্তি— !'

"হুম!'

পল্টু কয়েকটা চামড়ার সুটকেশ নিয়ে কয়েকবার নীচে ওপর যাতায়াত করছে। আমি দেখলাম ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। শেষবার পল্টু ওপরে এসে একটা অ্যাটাচি তুলে নিয়ে বললো, 'চল দিদি!'

ওরা যখন দরজার চৌকাঠে পা রাখলো বললাম, 'একটু দাঁড়াও! পল্টু তুমিও।'

'আলমারিগুলো একটু খোলো!' আমার কথাতে থমকে দাঁড়ালো ওরা। তপতী আস্তে আস্তে পা ফেলে ঘরের ভেতর ঢুকে এল। পল্টু দাঁড়িয়ে রইলো দরজার বাইরে। তিনটে

আলমারি একটার পর একটা খুলে যাচ্ছে তপতী। সব ফাঁকা। বুঝলাম যাবার পরিকল্পনা অনেক দিনের। আমি চোখ বুজে ছিলাম, দেখিনি, চেষ্টাও করিনি। শেষ আলমারিটাতে শুধু পড়ে আছে—'তপতীর বাবার দেওয়া বিয়ের সেই সস্তা লাল-পেড়ে শাড়িটা আর কাঠের সিঁদুর কৌটাটা। সেই দু'টো হাতে করে তুলে নিলাম—'তোমার বাবা-মার দেওয়া একমাত্র স্মারকটাই ফেলে যাচ্ছো! এটাই তো আগে নেবে। বাকী যেগুলো ভরেছো ওগুলো তো-সব এই ধান্দাবাজের…'

তপতীর পা নড়ছে না। মাথাটা নিচু হয়ে ঘাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। বললাম, 'নাও!' কাঁপা কাঁপা হাতে সে শাড়ি আর সিঁদুর কৌটাটা নিলো।

দিদির দেরী দেখে জুতো শুদ্ধ পল্টু ঘরে ঢুকে দিদিকে ধমক দেয়—'চল! চল! আর ন্যাকামি করতে হবে না।' দিদির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে চৌকাঠের ওপারে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে —'তা, এরকম একটা সুন্দরী গ্রামের ডাঁশা মালকে ১২ বছর ধরে ইয়ে করে ঝরঝরে বানাতে গেলে তো কিছু ছাড়তে হয় বাওয়া…!' কথাগুলো আমাকেই বলা! দুকান চেপে ধরলাম।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না হঠাৎ মনে হলো ওদের লরি ছাড়ার আওয়াজ তো শুনলাম না। আস্তে আস্তে উঠে জানালাটা খুললাম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি পল্টুরা লরিটাতে মাল গোছ-গাছ করছে, তপতী উপরের দিকে তাকিয়ে আছে, জানালায় আমাকে দেখে…না, না, ওটা আমার মনের ভুল…মনে হল চোখ-মুখ ছলছল করছে…কী একটা বলতে চাইছে—না, না, ও সব আমার মনের ভুল! কিন্তু আমি তো শুনতে পাচ্ছি একটা মানবী যেন চিৎকার করছে—"বাঁচাও! বাঁচাও!…পশুটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও… !'

'…এই যে আমার বুকের ভেতর! চামড়ার নীচে, পাঁজরার নীচে পশুটা ঘুমিয়ে ছিল তাকে তোমার অবহেলা আর পল্টুদের হাতছানি জাগিয়ে দিয়েছে…'

'আমি যাচ্ছি তপতী!' ছুটে নিচে নামার চেষ্টা করলাম

চৌকাঠের মুখেই কে যেন এক ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। ঘরের মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম···আর কিছু জানি না বুঝলে দাদা···'

॥ ছয় ॥

হাসপাতালে

সেই তপতী আমার সামনে বসে। যূথিকাদেবী বর্তমানে ফিরে এসে ওর দিকে তাকালাম। 'কী ভাবছিলেন দাদা!' যূথিকা প্রশ্ন করলো।

'না না, তেমন কিছু নয়! উদয়ের সঙ্গে শেষ দেখা হবার দিনে ও প্রশ্ন রেখেছিল, 'আজিজুলদা, পারবে তোমরা মানুষের ভেতর থেকে পশুটাকে তাড়াতে, শেষে সাংস্কৃতিক বিপ্লবও হেরে গেল!' ওকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম—'পৃথিবীর জ্বলন্ত-রূপটাই তো আজও শেষ হয়নি। আগুনে-সেই-পৃথিবী নিজের আদিমতার চিহ্ন বোঝাতেই মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে। দুর্বল জায়গা জুড়ে আজও তারা আছে! এগুলো তো মানুষকে সচেতন করে তুলছে। বৈজ্ঞানিকরা সেই সমস্ত জ্বালামুখগুলোকে বন্ধ করে দেবার উপায় ভাবছেন, মানুষকে সচেতন করে দিচ্ছেন! মানুষের মধ্যে কোথাও এই পশুরূপ ফুটে উঠতে দেখলে—অহংকারী মানুষই শিউরে উঠবেন! তাঁরাই সেটা চেপে দেবেন, কারণ নিজেদের এই রূপটা মানুষ দেখতে চায় না··· অত ভাবছো কেন?' আমার কথা শেষ হবার আগেই যূথিকা বললো—'দাদা! আমি শুধু টি-ভির জন্যই আসিনি—আপনাকে জানাতে এসেছি আমি ক্লান্ত!' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার শুরু করে—'আপনি হয়তো ভাবছেন 'আমাকে কেন?' কারণ—আপনিই একটা কথা বলতেন তাই!'

"কী?"

"বলতেন, দেখ তপতী ভোগে স্যাচুরেশান আছে, এক সময় মনে হবে কোথাও একটা নোঙর ফেলি! ত্যাগে কোন স্যাচুরেশান পয়েন্ট নেই···যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে···"

সেদিন বুঝতাম না দাদা, আজ ভাবি, যদি একেবারে ছোট

হয়ে ঐ আমাদের গরানহাটাতে যেতে পারতাম ! এই চক্রান্ত থেকে যদি মুক্তি পেতাম ! দাদা আমি আমি ক্লান্ত !…'

ভালো করে ওকে দেখলাম, মাথা নিচু করে ও বিড় বিড় করছে, কোথায় সেই যাত্রার নায়িকার চিৎকার ! তপতীর মুখের আদলটা ওর এই যূথিকা মুখের ওপর ভেসে উঠছে।

'পাশ্চাত্যে ভোগের স্যাচুরেশনে পেঁছে গেলে ওরা বেরিয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে, একদল হয় বীটলে—যাদের কলকাতাতে সেই সময় ঘুরে বেড়াতে দেখতে, গ্যাঁজাখোর সাহেব মেম ! আর একদল বেরিয়ে পড়ে ধর্মের খোঁজে !…সন্ন্যাসী…ওমুক ভগবান, তমুক যোগী, মেডিটেশন, এসবের কত রপ্তানী দেখছো না ? ওদের দেশে সন্ন্যাস আসে ভোগ আর প্রাচুর্য থেকে। আর আমাদের দেশে অভাব থেকে লোকে পরকালের চিন্তা করে। অভাবকে মেনে নেবার বা মানিয়ে নেবার একটা উপায়—সে সব থাক—পল্টু পারে না তোমাকে পুষতে ? ওর বার কেমন চলছে ?'

এবার তপতী মাথা তোলে। সরাসরি তাকায় আমার চোখে, 'ওটা একটা জানোয়ার ! আমার রোজগারেই খায়। সেটা কবে প্রাণরা নিয়ে নিয়েছে। শেষে কিছু টাকা দিয়ে লিখিয়েই নিল। না দিয়েই বা কী করবে ? প্রাণদের সঙ্গে ও লড়বে কী করে ? সোনাগাছিতে একটা ফ্ল্যাটে যায়—' যূথিকা ফুঁসছে—'যদি একবার এখান থেকে বেরুতে পারতাম !'

'দিদি তোর হলো ! এঁরা তাড়া দিচ্ছে !' বাইরে থেকে পল্টু তাড়া দিল। যূথিকা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে,—'দাদা, আজ তাহলে উঠি ?' যাবার জন্য পা তুলতে ওকে জিগ্যেস করলাম—'উদয়কে কি কিছু বলবো ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে তপতী বললো—'বলবেন ? হ্যাঁ, বলবেন ! বলবেন তপতীর মৃত্যুর জন্য ওই দায়ী। গ্রাম থেকে একটা বনবিড়াল ধরে নিয়ে এসে তাকে চোখ-ঝলসানো আলোয় ছেড়ে দিলো। তারপর নিজে রইলো নানান কাজে ব্যস্ত। বিড়ালটা সারাদিন আঁচড়ায়, কামড়ায়, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে—সে অমনোযোগী থেকেই গেল। কিছুই বুঝলো না। ক্রমশ বিড়ালটার চোখ আলো সইয়ে নিল। কিন্তু মাথাটা তখন

বিগড়েছে। এমন সময় একদল পশু এসে তাকে হাতছানি দিল, বললো—'ঘরের বাঁধা খাবারে সুখ কোথায়? আঁদাড়ে পাঁদাড়ে, ডাস্টবিনে তো কত ভালো ভালো খাবার! কী অবাধ মুক্তি!' ঘরে ডাল, ভাত খাও বলে রেস্টুরেন্টে চপ, কাটলেট খেতে নিষেধ কোথায়? ঘরেরটা তো আছেই—যৌবন থাকতে থাকতে সেগুলো চেখে দেখো!'

তারা আমার প্রতিরোধ ভেঙে দিলো। বুকের ভেতর জ্বালিয়ে দিলো লালসার আগুন! আমি ছুটলাম। তখনও উদয় আমাকে দেখে নি। তখনও ওই পারতো আমাকে শান্ত করতে।—

তারপর যেদিন দেখলো সেদিন সব শেষ!—ওর অবহেলা আমাকে ধ্বংস করেছে···ওকে আমি ধ্বংস করবোই!···' এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে যূথিকা চুপ করে। 'আজ আমি সর্বস্ব খুইয়ে সব দিতে চাই দাদা! আজ আমি দিতে চাই! ঘরে বন্দী হতে চাই! নোঙর ফেলতে চাই! সব দিতে চাই—" তপতী ভেঙে পড়তে পড়তে সামলে নেয়···কেবিনের দরজার দিকে পা বাড়ায়। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ওর চলে যাওয়া···।

যূথিকার বিদেশী পারফিউমের গন্ধ, তপতীর অব্যক্ত কান্না নিয়ে গুম হয়ে থাকি আমি। ওকে দেখে এক বুক ঘেন্না জমে ছিলো, কিন্তু যখন চলে গেল···একরাশ চিন্তা!

উদয় মরছে, তার ক্যান্সার! রোগের যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে, তপতী জ্বলছে। শঙ্করকে প্রাণের দল জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে···কোনটার তীব্রতা কম? বনের পশুরা স্ট্যাচু অব লিবার্টির ভেতর থেকে উল্লাসে নৃত্য করছে, 'মুণ্ডহীন দেহগুলো আহ্লাদে নেত্য করে—'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"To Jump a body with dangerous physic
That's Sure death without it."—

"বিপজ্জনক স্বাস্থ্য নিয়ে (যদি কোন কিছু পাবার জন্য লাফ দেওয়া হয়,) লাফের জন্য না হলেও, মৃত্যু সুনিশ্চয়!"

যখন জেলে ঢুকেছিলাম তখন অধ্যাপক বন্ধুরা অধ্যাপনা করতেই ভালবাসতেন, ছেলেদের শেখাতেন আমাদের দেশে শুধু কেন সারা পৃথিবীতেই সত্যিকারের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব আছে দুটো জিনিসের—ধর্ম এবং পাপ। তারা রাতের অন্ধকারে ছুরি হাতে সব তর্কের মীমাংসা করে নেয় নিজেদের মধ্যে, খুনী এবং বিচারক এরাই সত্যিকারের স্বাধীন, দুজনেই একই প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। বিচারকদের তাই খুনীর বিচার করাটা স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র। বিচারক যতদিন খুন চালিয়ে যাবেন ততদিনই সে পাপী।—'

জুরিসপ্রুডেন্সের কোন ছাত্র হয়তো জিজ্ঞাসা করলো—'স্যার পাপ কি?' অধ্যাপক লেকচার প্ল্যাটফরম থেকে একটা পা ক্লাসরুমে ফেলে বললেন—'সামাজিক মানুষ হিসাবে যে-কাজ করতে তোমার দ্বিধা হয়, যে-কাজ করে তুমি সর্বসমক্ষে বলতে পারো না সেটাই পাপ।'

ছেলেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতো। অধ্যাপক তাদের মধ্যে গড়ে তুলতেন একটা 'রিফ্লেক্স অব পারপাস'। নেচার আর নারচার সমস্যার সমাধান করতেন। জন্মসূত্রে আনা গুণাবলীগুলো মোটিভেট হতো নির্দিষ্ট দিকে।

যখন জেলে এসেছিলাম—লেখক, গল্পকাররা তখনও মানুষের ছোট ছোট অনুভূতিগুলো তুলে ধরতেন। আঁকতেন অহংকারী মানুষের চরিত্র। যে মানুষ পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারে না, তারাই হ'তো ভিলেন চরিত্র বা খলনায়ক, জটিলতার কারণ। তাঁরা পাঁক ঘাটতেন, সেটাকে সার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য, ড্রেনে

পড়া রাস্তার কুকুরের মত, সারা গায়ে পাঁক মেখে উঠে এসে গা-ঝাড়া দিয়ে পথচারির জামা-কাপড় নষ্ট করতেন না। বলতেন না, মা, ছেলে, মেয়ের বাইরে যে কোন সম্পর্কই অন্তর্নিহিত ভাবে যৌন সম্পর্ক!' তখন তাদের যৌনাঙ্গ মস্তিষ্ককে পরিচালনা করতো না, মস্তিষ্কই পরিচালনা করতো যৌনাঙ্গকে।

আমি যখন জেলে ঢুকেছিলাম শিল্পীর হাতে তখন ফুটে উঠতো তাঁর শিল্প কর্ম। লোভ লালসার জীবন্ত মূর্তিগুলো দেখে গা শিউরে উঠতো। লালসার বলি ওলোন-ভর্তি দুধ নিয়ে পেট-ফেটে পড়ে-থাকা গরুর ছোট ব্রোঞ্জ ঢালাই-এর নাম দিতেন "সম্ভাবনার মৃত্যু।" পোর্ট্রেট আঁকতেন অহংকারি মানুষের। পেডিকিওর করা সুন্দর পা-টা দেখাবার জন্য 'গিমিক' দিতে হতো না। সেদিনও শিল্প ছিলো পণ্য, তবুও কোন শিল্পী তার নিভৃত সাধনাকে পণ্য উৎপাদকদের হাতে তুলে দেবার কথা ভাবতে পারতেন না। চোরাকারবারীদের মত রাতের অন্ধকারে দু-চারজন লোকের সামনে লোক চক্ষুর আড়ালে গোপনে নিজের শিল্পকে পণ্য উৎপাদকদের কাছে বিসর্জন দিতেন তাও ঠিক। কিন্তু ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিসর্জন দেবার সাহস তাদের হতো না। তখনও তপতীরা রান্না করাটাকে ছোটলোকের কাজ হিসাবে দেখতো না। কেউ যদি বলতো, 'রাঁধার পর খাওয়া—খাওয়ার পর রাঁধা—এই নিয়েই কি কাটিয়ে দেবে তপতী?' সে খুব স্মার্টলি জবাব দিতো, 'বাঁচতে গেলে খেতে যখন হবে তখন তো কাউকে-না-কাউকে তো রান্না করতেই হবে! আমার যদি অসুবিধা হয় অন্য কেউ করলে তার বুঝি হবে না?'

'কিন্তু এত সময় তুমি ঐ ছোট ঘরটাতে নষ্ট করবে?'

'যে রাঁধে সে তো চুলও বাঁধে! রান্নার জন্য কোন কিছু আটকে যায় না।'

হাতের সেপ নষ্ট হয়ে যাবে যুক্তিতে তখন মধ্যবিত্ত মেয়েরা রান্না করাটাকে অপবিত্র কাজ বলে মনে করতো না।

'তপতী তুমি তো হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খেতে পারো?'

"ম্যা গো! রক্ষে কর! আমি অঞ্জন বাড়িবো/ব্যঞ্জন সারিবো

তবু হাঁড়ি ছুঁবো না,'…বলে মুখে আঁচলচাপা দিয়ে খিল খিল করে হাসতো।

যখন জেলে গেলাম তখনও শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব ছিল, কিন্তু তার জন্য হাফ-গেরস্থপনা ছিল না। না-হইবো সতী, না-হইবো অসতী / তবু পতি ছাড়বো না—মার্কা চিন্তা তখনও দানা বাঁধে নি।

ব্যাঙ্কের কেরানী তখনও ভালবাসতো মানুষকে। গাড়িতে লিফ্‌ট্‌ পাবার জন্য কোন বড়লোক বন্ধুর মোসাহেবগিরি করার কথা ভাবতে পারতো না।

সিনসিয়রিটি আর ডিভোশন কথা দু'টোর মূল্য তখনও ছিলো। বাকিরা অর্থাৎ অসৎরা এই দু'টো কথাকে যমের মত ভয় করতো।

আর আজ জেল থেকে মুক্তি পাবার প্রাক্কালে দেখছি হায়েনা-ধর্মী অধ্যাপক, সর্প চরিত্র বিশিষ্ট কেরানী, ভাদুরে কুকুর মার্কা লেখক, শৃগাল-ধূর্ত শিল্পী, ঘি-দুধ খাওয়া কাবুলী বেড়াল মার্কা গৃহবধূ—যার গলায় একটু সুড়সুড়ি দিলেই কোলের ওপর ঢলে পড়ে এখুনি ঘড় ঘড় করবে।

তারা বাঘ সিংহের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্য দল বেঁধে উচ্ছিষ্টের সন্ধানে যাচ্ছে, তারপরে একে অপরকে তাড়া করছে, আঁচড়াচ্ছে, রক্তাক্ত করছে।—এক সর্বগ্রাসী সর্বভুক চরিত্র তাদের তাড়া করছে। এরা সকলেই আমার বন্ধু, আমার রক্তজাত, আমার বিবর্তিত পশু দিক। যে দিকটা কয়েক লক্ষ বছর আগে আমি ফেলে এসেছি আধুনিকতার নামে তারা আজ আমার সামনে। তাই এরা আজও আমাকে ভুলতে পারেনি, আমার গায়ে দারিদ্র্যের পেট্রল ছিটিয়ে লালসার আগুন ধরাতে চায় এরা। আমার অতীত আমাকে তাদের মধ্যে পেতে চাই—আমার অতীত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে আমার ভবিষ্যৎকে তাই আমার বর্তমান বিপন্ন। এক পতনের কিনারে কিনারে ঘুরছি—।

মাথা ভার, কানে বাজছে : 'বিষাদে ভারাক্রান্ত কোরো না হৃদয়
দুনিয়ায় এগিয়ে চলার পথে
রেখো সদা সুদূরদর্শিতা….

তাহ'লেই তুমি সব উজান বেয়ে 'তীরে' পে'ছিবে—কিন্তু এ কী, আলোকদ্যুতি ?'

প্রতিদিন কাগজে ছবি ছাপা হয় এরকম গুটিকতক রাজনীতি-বিদদের একজন আলোক। আমরা যখন CPI (M) করতাম তখন এসেছে পার্টিতে, পার্টির সোনার হাঁস ভগবানে আছে, মার্ক্সেও আছে, শুধু নেই ছাপা অক্ষরের সঙ্গে সম্পর্কে।

'তাহ'লে বেরুচ্ছ ?'—বসন্তের দাগ ভর্তি মুখটা তুলে সরাসরি প্রশ্ন রাখে ও।

'তাই তো মনে হচ্ছে, তোমরা পারলে না আটকে রাখতে !'

'যাবে তো, আমাদের জেলাতে ? সোনেই থাকবে তো !'

'আপাতত তাই তো মনে হয়'

'একটু সাবধানে থেকো !'

'হুমকি ?'

'না, অনুরোধ। বাইরের অবস্থা কিছু জানো না, দুমদাম কিছু করতে যেও না !'—

ওর শেষ কথার উত্তরে বললাম—"তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি ! একেই বেঁটে তাতে যা মুটিয়েছ, ভুঁড়ির 'সারকামফারেন্স' তো 'ওয়ান-ডে ক্রিকেটের সার্কেল' !"

'আর বোলো না মাইরি ! এটা আর কমছে না, সব খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'আসলটা তো ছাড়োনি ? মাল খাওয়া ! দুধরণের মাল খাওয়াই ছাড়ো।' আমি রসিকতা করলাম।

ও, অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'মানে ?'

'মানে ? সোজা বাংলায় মদ এবং টাকা—' আমার উত্তর।

'কোথা থেকে যে তোমরা এসব শোনো ?'

'শুনবো কেন ? দেখছি তো ? তোমার কথাটা ভাবো তো আলোক ? বস্তীতে ইঁটের গাঁথনি খোলার ছাউনি একটা বাড়ি, বিধবা মা। পার্টির নির্দেশে কলকাতার একটা কলেজে এলে ছাত্র-আন্দোলন করতে। তখন ? ছাত্রফ্রণ্টে আমিই একমাত্র রোজগেরে ! রোগা, দারিদ্র্য মাখামাখি চেহারা ! যখন তখন চলে আসতে আমার হস্টেলে, সারাদিন খাওয়া দাওয়া হয়নি। শুধু খাওয়াতাম-ই না,

হাতে পয়সা গুঁজে দিতাম পরের দিন খাবার··· একটু থেমে বলতে লাগলাম, 'তোমার হবু বউ-এর টি-বি হল। একটা পুরুষদের হস্টেলে তোমাদের রেখে তিনটে মাস তার চিকিৎসা হলো।···' ও কী একটা বলতে যাচ্ছিলো। থামিয়ে দিলাম···। 'না, না, তার জন্য কিছু বলছি না, সেদিন তো তোমার জন্য করিনি, তুমি একটা আদর্শে বিশ্বাস করতে. সেই মতাদর্শের জন্যই করেছি··· কিন্তু আজ? এই আট-দশ বছরে? সল্টলেকে বাড়ি করেছ, নিশ্চয় গাড়িও আছে, সাফারি স্যুট গায়ে···' চুপ করে গেলাম, ভাবতে চেষ্টা করলাম আলোক কী সেদিনগুলোর কথা ভাবছে? না, সে রকম কিছু যে ও ভাবছে না সেটা ওর কথা থেকেই বোঝা গেল—'তা বলে কী সারা জীবন কষ্ট করতে হবে নাকি'? তোমাদের এই কৃচ্ছ্রসাধনের রাজনীতি আমি মানি না। এটা তো গান্ধীবাদ। কষ্ট আমার স্বীকার করি কিন্তু সুযোগ পেলে আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য পেতে চাই!'

হেসে ফেললাম—'কী বললে? কৃচ্ছ্রসাধন? গান্ধীবাদ? তাহলে তো বলতে হবে ঐ লেনিনটাই সবচেয়ে বড় গান্ধীবাদী ছিলেন। দেশের লোক ভিটামিন সি পাচ্ছে না, তাই তিনি লেবু খাওয়া ছাড়লেন! তোমরা ভুলে যাচ্ছো কাগজগুলো তোমাদের মার্ক্সবাদি বলে প্রজেক্ট করে মানুষের মধ্যে একটা মার্ক্সবাদি-লেনিনবাদি ইমেজ প্রতিষ্ঠা করেছে তোমাদের সম্পর্কে, আমি জানি, তুমিও জানো, সেটা তোমরা আদপেই নও! কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে তোমরা বামপন্থী, মার্ক্সবাদি, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ মানুষ নজর রাখছে! তোমাদের আচরণের ভুল, জীবনযাত্রার বেলাল্লাপনা, মার্ক্সবাদের ভুল বলে চিহ্নিত হচ্ছে,···' একটু দম নিয়ে আবার বললাম 'আর? মানুষ তো প্রশ্ন তুলতেই পারেন তোমার সামাজিক যোগ্যতা নিয়ে? একটা অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট তুমি, কোন যোগ্যতায়, কীসের বিনিময়ে এই ক'বছরে এই বিশাল পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে!'

'তুমি ভুল করছো, আমার কিছুই নেই!···'

'ওই হল। তোমার নেই তোমার ছেলের আছে. বউ-এর আছে? ওসব আমাকে কেন বলছো?'

'তাহলে তুমি কী বলতে চাও জ্যোতিবাবু ডিজঅনেস্ট!' ও রেগে গেছে! 'দ্যাখো বাজারী কাগজগুলোর মত আমি বলছি না, জ্যোতিবাবু চন্দনকে রেকমেণ্ড করে কিছু পাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একবার ভাবো তো একটা সরকারি টেণ্ডার কিংবা প্রজেক্ট নোটিশ দেওয়া হয়েছে, একটা কমিটিও হয়েছে, সেখানে অনেকেই আবেদন করেছেন, চন্দনও করেছে, চন্দন বায়োডাটাতে লিখলো—চন্দন বোস সন অব জ্যোতি বোস। এটাই কী কমিটিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করবে না? জানো এরই জন্য বিপ্লবের পর চীনা পার্টিতে একটা নিয়ম চালু করে ছিলেন মাও সে-তুং—কোন নেতার, মন্ত্রীর ছেলে সরকারি ব্যবসা বা টেণ্ডার পাবে না…'

'তা হলে মন্ত্রী বা নেতাদের ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে মরবে?'

'তা কেন? অনেক কাজ আছে? সেগুলো করবে?'

'কংগ্রেসী আমলে, কংগ্রেসীরা কী কিছু করেনি?' আলোক উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে দেখে হেসে শান্ত গলায় বললাম, 'ওরা তো করবেই! এটাই ওদের কালচার! কংগ্রেসীদের আমি বিরুদ্ধে কেন জানো? ওরা যা বলে ওরা তাই, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কেন জানো? তোমরা যা বলো সেটা নও বলেই…' আলোক কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করতে থাকে বোধ হয়। ওকে বোঝাবার জন্যই বলি—'একী কালচার তৈরী করছো বাংলার মাটিতে! এই কালচারেই তো বি-জে-পি জন্মাবে। গর্বাচভ জন্মাবে।'

'কমরেড গর্বাচভ বলো!' ও দাবী করে।

'এখনও কমরেড গর্বাচভ? আর কতদিন বলবে বাবা?' আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর!

'তুমি বিশ্বাস করো না সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র হয়েছিল?'

'আলবৎ! ভিত্তিগুলো তৈরী হয়েছিল তো বটেই!'

'সমাজতন্ত্র হয়ে গেলে সেই দেশটা আবার পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে যেতে পারে! মায়ের পেট থেকে একবার বাচ্চা বেরিয়ে গেলে তাকে আবার ঢুকিয়ে দেওয়া যায়?'

'না, অ্যাজ-সাচ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু গলাটিপে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলে পঞ্চভূতে বিলীন করে দেওয়া যায়। সেই

সেই উপাদানগুলো মায়ের পেটে ঢুকে গেলেও যেতে পারে ?'

'তোমার এ তত্ত্ব কে মানে শুনি ? আই-পি-এফ-ও তো মানে না ?'

'সকলকে মানতে হবে, তোমাদেরও, তবে স্বীকার করতে তোমরা লজ্জা পাবে। যেমন আজ স্বীকার করতে চাও না তোমরা কী ছিলে ?...'

আলোক চুপ করে থাকে। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আমিই শুরু করি...

'জানো, জেলে তোমাদের মেডিকেল ফ্রণ্টের এক নেতা এসেছিলেন আমাকে পরীক্ষা করতে, কী বললেন জানো ? বললেন, গোটা পার্টি'তে এখন কংগ্রেসী কালচার চলছে। মাথা ভুগছেন সান্'স সিনড্রমে ! এটা শুনে এখানকার জুনিয়ররা বললেন— স্যার ! ভুল করছেন স্যার ! আপনার আমার পোলাপানরা কান্নাকাটি করলে আমরা তাদের একটা খেলনা গাড়ি, কিংবা বিস্কুট কিনে দিয়ে শান্ত করি ! রাষ্ট্রের মাথা, রাজ্যের মাথা, তাঁদের মাথা তো ঠিক রাখতে হবে, তাঁদের পোলাপান তাই কাঁদলে তাঁরা কেউ গাড়ির কারখানাটাই কিনে দেন, কিংবা বিস্কুটের কারখানা, এতে অন্যায় কী আছে ?'

আলোক গুম হয়ে গেল। আমি প্রমাদ গুনলাম ও এখন-ই না চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। মুশকিলে পড়বে বেচারা পুলিশগুলো। আলোচনাটাকে তত্ত্বগত লেবেলে টেনে আনার জন্য বললাম, 'এরা কী করছো বলো তো ? মিঠুন, রেখার কোমর ধরে নাচা, বাবু কালচারকে উসকিয়ে তোলা ? তাহলে রামের আঁতুর ঘর খোঁজ করে বি-জে-পি কী অন্যায় করেছে !'

'জনগণ চাইছে !'

'দ্যাখো ! জনগণ কী চাইছেন একটু ভালোভাবে কান পেতে শোনো। জনগণ একমাত্র চান তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। আর কিছুই তাঁরা চান না। এরই জন্য তাঁরা চান এমন একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে তাঁরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস হবার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন।

প্রজাতিকে রক্ষা করা, নিজেকে রক্ষা করা এটা হচ্ছে জীবের ধর্ম। আমরা যেটাকে বলি রিফ্লেক্স! তোমরা যেটা করে থাকো, এই 'রিফ্লেক্স' দুটোকে কাজে লাগিয়ে, মানুষকে বোঝাচ্ছো তার অস্তিত্বই বিপন্ন! এই রকম ভাবে মানুষের মধ্যকার ভয়টাকে কাজে লাগিয়ে তাকে শর্তাধীন করে তুলছো···ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ অনাগত দিনের প্রতি তাদের ভয় থেকেই তোমাদের কাছে আসছে ···হিটলার ঠিক এটাই বলেছিলো—ফিজিকাল অ্যাণ্ড মেণ্টাল টেরর ইজ দ্য কি টু বিল্ড অ্যান অরগানাইজেশন।' শারীরিক এবং মানসিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করো, লোক জোগাড় করো···তোমার মাস্‌ল আর প্রশাসন এই দু'টোই এখানে প্রধান অস্ত্র···। আর মাসল্‌ম্যানদের মোটিভেট করতে তোমাকে আদিম প্রবৃত্তিগুলো উস্কে দিতে হচ্ছে···আর এরই জন্য···মিঠুন এবং রেখার আমদানি ···' একটু থেমে ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলো তাই না?···কিছু টাকাও এল, ছেলেগুলোকেও আত্ম-জাহির করার সুযোগ করে দেওয়া হল,···পার্টি'তে প্রভাবটাও থাকলো, নির্বাচনে জিততে হলে আলোকদ্যুতিকে চাই, চাই! বলো তাই না?'

বুঝতেই পারছিলাম ও রাগছে, ফুঁসছে। ওর রাগটা আর একটু তাতিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'কাল অবধেশ এসেছিলো, সে তো বললো, 'একজন মোস্ট সিনিয়র লোকের ক্লিকটাই বাংলার বামপন্থাকে খতম করছে, এমন কি তোমাদের পার্টি'র কালচার-টাকেই শেষ করে দিয়েছে···'। আলোক এবারে ফেটে পড়লো, 'তা তাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন— তার মন্ত্রী তো শুধু বড় বড় তত্ত্ব আওড়েই খালাস! একটা পয়সা, একটা মানুষ দিতে পারবে? এমন কী ওকে জেতাতে হলেও 'আলোক, তুমিই দ্যাখো!' একবার তো কাঠি করতে গিয়ে হেরে ভূত হতে হয়েছিলো।'

'আহা তুমি রেগে যাচ্ছো কেন? অবধেশ কী আর সত্যি সত্যিই এসেছিলো! আমিই বললাম আমার কথাগুলো, তোমার কি দোষ বলো? গোটা পার্টি'টাকে ভোগবাদের যে চূড়ান্ত পর্বে তুলে দিয়েছো, এখন এছাড়া উপায় নেই। এখন নওজোওয়ান গান তাদের কাছে হাস্যকর! ফন্টা, জ্যাকসন না হ'লে রেকর্ড! কী উদ্দামতা, কী মিউজিক! শম্ভু ভট্টাচার্য খেতে পায় না, রানার

কিংবা অহল্যা আবার কোনো নাচ ? রেখার শরীরে কেমন বিদ্যুৎ খেলে যায় ! বলো ?'

ও চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি চুপ করবে ?' মাথায় চুলের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে পুরানো দিনের অভ্যাসে মাথাতে দু-চারবার আঙুল-চিরুনি চালালো।

'হ্যাঁ, এবার চুপ করবো। শুধু একটা কথা, সন্ত্রস্ত মানুষ বেশীদিন 'ভয়' বয়ে বেড়াতে পারে না। সে ভাবতে শুরু করে সে বিপন্ন, বিকল্প আশ্রয় খোঁজে। কংগ্রেসে ভয়, তোমাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো, কংগ্রেসের ভয় তার আছে, তোমরাও তাদের সরিয়ে নিয়ে এসে তাদের মধ্যে কোন্ 'রিফ্লেক্স অব পারপাস' গড়লে না, সেরেফ নেতিবাচক রিফ্লেক্স গড়ে ঠেলে দিলে এক বিপজ্জনক দিকে ···সেই চাষকরা জমিতে ফ্যাসিবাদ আসছে···সে কিন্তু কার রক্ত গাঢ় লাল, কার ফিকে সে-সব দেখবে না !···ফ্যাসিবাদকে গণতন্ত্রি-করণের কাজে নেমেছে যে পার্টি তার নাম বি-জে-পি। তারা মানুষের মধ্যে তোমাদের কাজ তুলে তুলে প্রথমেই মানুষের প্রতিরোধটা ভাঙছে, তাদের বোঝাচ্ছে, 'তোমরা বিপন্ন, তোমাদের ছেলেমেয়েরা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে'··· এবং সেটা বাস্তব। মানুষ মানসিক ভাবে প্রতিরোধ হারিয়ে ফেলছে। এই ফাঁকে তারা ধর্মের ঘোড়া ছুটিয়ে 'সদর্থক' রিফ্লেক্স গড়ে তাদের শর্তাধীন করছে, তোমরা রাজনীতিকরা যেটাকে বলো 'মোটিভেট' করা। আমরা বলি সংস্কৃতিগত ভাবে মানুষকে পক্ষে টানা। তাই ইতিহাসে দেখা গেছে প্রত্যেকটা সামাজিক অভ্যুত্থানের আগেই একটা করে সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান হয়েছে। বসন্তের আগে যেমন কোকিল ডাকে কিংবা 'বাঘের আগে ফেউ', এই কাজটা সব পার্টিকেই করতে হয়···তা সে প্রগতিশীল হোক কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল ! ধর্মীয় পুনরুভ্যাথানবাদ হ'চ্ছে প্রতিক্রিয়ার সপক্ষে জনমানস প্রস্তুতির পর্ব···ফ্যাসিবাদের আগমনবার্তা। মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তির সংস্কৃতিটা ঢুকিয়ে তোমরা তার জন্য জমি চষে যাচ্ছো··· আপশোষ !'

আলোক উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে, প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো, 'সোদপুরে থাকতে গেলে তোমার এসব বলা চলবে না !'

এবার গম্ভীর ভাবে চ্যালেঞ্জ করার পালা আমার, 'কাকে সামলাবে? আমাকে, না বি-জে-পি-কে, না, কংগ্রেসকে! তুমি এ-রকম বলতেই পারো। কারণ আমার সবচেয়ে বেশী ধ্বংস (টাকা) করেছ তুমি। কিন্তু তোমার পার্টির অন্যরা তা বলবেন না, কারণ তারা জানেন এগুলো সত্য। জানেন আমার এইসব বলা এবং করা শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদকেই রক্ষা করবে…কারণ চিটেগুড়ে পিঁপড়ে পড়ার মত তাঁরা ঐ গদীতে আটকে গেছেন বলেই বলতে পারছেন না, আসলে তারা এগুলোই বলতে চান।…'

'হুম!' বলে আলোক দাঁত কিড়মিড় করে, 'এই সমস্ত রেনিগেডরাই তো তোমাদের শক্তি! অতীতে জোগাড় করেছিলে সতীশ পাকড়াশির মত বুড়ো ভামকে…এখন আবার ব…ব…' বলে হঠাৎ থেমে গেল। নামটা উচ্চারণ না করেই ও ফুঁসতে থাকে 'না হ'লে এসব আঁতলেমি একদিনেই শেষ করে দিতাম…।' আমি হাসতে থাকি, আলোক আরও রেগে যায়। 'রেনিগেডগুলো ভুলে গেছে তোমরা আমাদের এগার শ' কমরেডকে খুন করেছিলে…'

'আর আমাদের খুন হয়েছিল এগার হাজার…। তোমাদের জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তরা বহাল তবিয়তে বেঁচে গেলেন… আমরা হারালাম আমাদের সরোজ দত্ত, চারু মজুমদারদের…আর তাছাড়া বলো তো কারা এই খুনগুলি প্রথম শুরু করলো… ১৯৬৮ সালের ২৩শে নভেম্বর বাগবাজারে মিছিলের ওপর কারা প্রথম বোমাবাজী করলো আলোক? তোমাদের ছোঁড়া সেই বোমাতে সমীর মারা গেল। তখনও তো আমরা পাল্টা পার্টি গড়িনি…তবু কেন সমীরকে মারলে বলো? তুমি তো খুব ভালো করে তাকে চিনতে? একেবারে খেটে খাওয়া ছেলে! বলো তো যাদবপুর ইউনিভারসিটির দুটো আনকোরা নতুন ছেলেকে কে বা কারা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল…তারপর ঢাকুরিয়া ব্রিজের শেষে তখন সেখানটাই কচুরিপানা ভর্তি বিল ছিল, সেখানে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হলো? কে বা কারা এসব করেছিলো? তখনও আমাদের অনেকেই তো পার্টিতে ছিলো।…তোমরা তো এখন মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তর তোমাদের হাতে। এগুলো জানাও না একটু দয়া করে? তোমাদের এগারশ'র মধ্যে ক'টা আমাদের হাতে মরেছে,

ক'টা তোমরা নিজেরাই সুযোগ বুঝে সরিয়েছ ? তুমি আলোকদ্যুতি চক্রবর্তী, তুমি বলতে চাও জানো না ? আমি যদি বলি ঐ এগারশ'র অন্তত তিনশ' চলে আসার চেষ্টা করছিলেন আমাদের সঙ্গে. তুমি অস্বীকার করতে পারবে…?' একটু দম নিয়ে আবার ওকে বললাম, 'কিছু মনে কোরো না, সেই কবে থেকে একই ভাঙা রেকর্ড আমাদের এগারো শ' মেরেছে,—এগারো শ' মেরেছে, শুনতে শুনতে কান পচে গেল…তোমরা খুব ভালো করেই জানো সেই সময় পার্টিতে যে-রকম ভাঙন ধরেছিল—মারামারি না বাধিয়ে পার্টিটাকে তোমরা টিকিয়ে রাখতে পারতে না…সাধারণ সদস্যদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারতে না, পার্টিটাকে রেজিমেণ্টেড করাতে পারতে না। ইন্দিরা এবং সোভিয়েতের নির্দেশ কার্যকর করতে পারতে না তোমাদের কমরেডদের দিয়ে। কী নির্দেশ ছিলো সেটা নিশ্চয় আমাকে বলে দিতে হবে না…? হবে ? তবে শোন, ছাপানো সার্কুলার ছিলো দিল্লীর স্বরাষ্ট্র বিভাগের। পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠানোর জন্য কলকাতা এবং পশ্চিম বাংলাকে নকশাল মুক্ত করতে হবে। পেছনে জ্বলন্ত গ্রাস-করতে-এগিয়ে-আসা-অগ্নিশিখা ফেলে রেখে কোন বাহিনী এগিয়ে যেতে পারে না…। সেইজন্য তোমরা ফাঁদ পেতেছিলে… আর আমাদের মধ্যেকার কিছু 'গ্যাঁপো' সেই ফাঁদে পা দিয়ে নতুন ছেলেদের জড়িয়ে ফেললে…তারা শহরে আটকে গেল…জোতদার-গুলো বেঁচে গেল…. নিজেরা ধ্বংস হলো !… আজ নিশ্চয় তুমি বলবে না চ্যাটার্জি আমাদের লোক ছিলো ?' আমার গলার স্বর চড়ছে, বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে হাত ধরে আলোককে বসিয়ে দিলাম। 'তোমাকে যখন পেয়েছি তখন তোমাকে শুনতেই হবে….কৈফিয়ৎ আমি চাইছি না, চাওয়ার অধিকার নেই। সেটা চাইবে তোমার ছেলেমেয়েরাই। বেলগাছিয়ার মিল্ক কলোনিতে কে হামলা করে তিনজন কর্মীকে খুন করেছিলো বলো তো ?….সে সব বাদ দাও….এত হাক-ডাক করে যে কমিশন তোমরা তৈরি করলে তার রিপোর্টটা প্রকাশ করছো না কেন ? কাশীপুর বরানগর নিয়ে আজ তোমরা প্রায়ই বিবৃতি দাও, বক্তৃতা করো, তুমি আলোক বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করো

তো পুরো একটা দিক থেকে তোমরা…হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোমার নেতৃত্বে তোমাদের বাহিনী আক্রমণ করেনি…? সি-পি-আই-এর মত অপেরা পার্টিকেও সেখানে এই গণ-হত্যাতে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিলো, জনৈক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে…এসব আমার কথা নয় তোমাদের নিয়োগ করা বিচারপতির ফাইণ্ডিংস! কেন করতে হয়েছিলো জানো? কারণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে ছিলো ওখানেই জমায়েত হয়ে নকশালরা নিজেদের সংগঠিত করছে। গ্রামে অপারেশান চালাচ্ছে…পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন মুক্তি যুদ্ধকে ভারত বিদ্বেষী করে তুলছে…' আলোক ঘামছে, ওর চুল-বিহীন মাথা এবং কপালে বিন্দু বিন্দু জলকণা—আর অনেক দিন পরে আমারও মাথায় ভূত চেপেছে…'এর পুরস্কার তোমরা পেয়েছ …পশ্চিমবাংলার সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলোই পেয়েছে…শাসক এবং শোষক শ্রেণীর কাছে তোমাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে… বিপরীত শক্তি হিসাবে নয়…বিকল্প শক্তি হিসাবে তারা এই কংগ্রেসের অঞ্চলটা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে…যতই তোমরা দিল্লীর জুজুর ভয় দেখাও, দিল্লী তোমাদের গায়ে হাত দেবে না। তাদের সেই হিম্মত হবে না কারণ তারা যাদের সেবাদাস হয়ে করে কম্মে খাচ্ছে তাদের সেই প্রভুরাই তোমাদের এখানে বসিয়েছে…'

এবার চুপ করলাম, আলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললো 'আজ আসি, বাইরে বেরিয়ে দেখা করবে না জানি, তবুও বলছি দেখা কোরো? কী করবে?'

কলমটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম…'কী জানি? এখনও ভাবিনি।' 'সবাই বলে তোমার বুক-রিভিউগুলো নাকি চমৎকার হয়…তার বাইরে কিছু লিখতে যেও না…আমি না হয় সাগরময়কে বলে দেবো…'ওকে বাধা দিলাম…'সে কী আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গেও তোমার এত দহরম মহরম সেটা জানতাম না তো!' 'গিভ অ্যাণ্ড টেক সম্পর্ক! নাথিং এল্‌স্‌!'

আলোকের জবাব শুনে একটু হাসলাম, 'না তার দরকার হবে না। সে প্রয়োজন হলে আমিই যোগাযোগ করে নেবো…কিন্তু তুমি কী নির্দেশ মানে হুমকি দিচ্ছো…যাতে অন্যকিছু না লিখি?'

'না না, তা কেন? সব কথাকে বাঁকাভাবে নেওয়া তোমার চিরকালের স্বভাব....বলছিলাম বাইরের অবস্থা তো খুব খারাপ.... একটু সাবধানে....যা করবে একটু সাবধানে করবে....যখন প্রয়োজন হবে বলবে....'

আলোক আস্তে আস্তে কেবিনের দরজার দিকে পা বাড়ালো....। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম.... । নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

এরা সব এক সময় আমার বন্ধু ছিলো, সাথী ছিলো, একই সঙ্গে আমরা মরতাম, বাঁচতাম, একটাই স্বপ্ন আমাদের এক জায়গায় এনেছিলো....শোষণ মুক্ত ভারত....আর আজ? ওরা শাসক কিংবা শাসকদের শাসন বজায় রাখার জন্য নানান যুক্তি হাজির করনে-ওয়ালা যুক্তিবিদ অথবা তাদের উচ্ছিষ্ট পাবার জন্য তাদেরই এক সময়ের সাথীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। একে অপরকে কামড়ে-আঁচড়ে উচ্ছিষ্টগুলো থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে, জমাট অন্ধকার....সুতরাং বাইরে বেরিয়ে কোথায় পড়বো আন্দাজ করতে পারলাম....শুধু অকৃত্রিম সুহৃদ সম্পাদক নোট পাঠিয়ে যাচ্ছে, 'মানুষ আছে, সংকটও আছে...কেউ আপনাকে কৃপা করছে না। আমরা আপনাকে যেটুকু টাকা দিই ভেবেছেন কী করুণা করে দিই! মোটেই নয়। আপনার লেখার পাঠক আছে তাই দিই। আপনার লেখার পাঠক আছে মানেই একেবারেই জমাট অন্ধকার নয়....'

যে-স্বপ্নে আমরা শর্তাধীন হয়েছিলাম সেই শর্তগুলো যে-কোন কারণেই হোক ওরা ভেঙে দিয়েছে। নতুন করে আমার বন্ধুরা শর্তাধীন হয়েছে।

হুমকি, প্রলোভন আর অভাবের ঠেলায় মুক্তি আসন্ন। পৃথিবীর পথে এরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে...গড়ে উঠছে এক অদৃশ্য-প্রাচীর। সেখানকার অধ্যক্ষ কে? পাহারদার কে? সে প্রাচীর ভাঙার সংগ্রামে কারা আমার সাথী হবেন! যোগ্যতা নেই, সামর্থ্য নেই, গাছে আঙুর ফল ঝুলছে, দেখলে টক বলে চলে যাওয়া যায়। সেটা তেমন কষ্টকর নয়। কিন্তু যোগ্যতা আছে, পেছনে অভাবের তাড়া, লাফ দেবার চেষ্টাও করতে হয় না শুধু একটু হাত বাড়ালেই সব, এই অবস্থায় হাতটাকে পেছনে রেখে স্বেচ্ছায় শেকল পরানোটা খুব-ই যন্ত্রণাদায়ক!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচিল অদৃশ্য, শত্রুর মুখ আবছা, এবার বন্দীর সংখ্যা ৮০ নয়, আশি কোটি

॥ এক ॥

'মাননীয় বিচারপতি এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারি নাগরিকবৃন্দ ! তোমাদের মনের আশা পূরণের জন্য আমি নিজের সমর্থনে কোন যুক্তি দিচ্ছি না। তোমরা ভাবতে পারো এবং প্রত্যাশা করতে পারো আমি সেটা করি কিন্তু না, আদৌ আমি সেটা করছি না।

আমি আদিষ্ট হয়েছি এই রাষ্ট্রটা আক্রমণ করার জন্য। রাষ্ট্র হল একটা মহৎ সুন্দর ঘোড়া, তার বৃহৎ আয়তনের জন্য সে শ্লথ-গতি এবং তার গতি দ্রুততর করার জন্য তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য দংশক-মক্ষিকার প্রয়োজন, আমি মনে করি আমিই সেই দংশক-মক্ষিকা।

আমি সর্বস্থানে, সর্বক্ষণ তোমাদের দেহে হুল ফুটিয়ে তোমাদের ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট। আমি যুক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করি এবং প্রত্যেককে তিরস্কারের দ্বারা তৎপর করে রাখি ।

নিদ্রালু লোকদের জাগিয়ে দিলে তারা যেমন বিরক্ত হয়, তেমনিই তোমরা বিরক্ত হচ্ছ, সন্দেহ নেই। যদি আমার অভিযোগ-কারিদের কথা তোমরা শুনতে তাহলে এক ঘায়েই আমাকে শেষ করে দিতে পারতে এবং আর একজন দংশক-মক্ষিকা না-আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে···আমি জানি···।

আমি যদি অন্য মানুষের মত হতাম, তাহলে নিজের বিষয় সম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে বৎসরের পর বৎসর এই সব করতাম না। অথবা যদি আমার এই উৎসাহদানের জন্য টাকা নিতাম, তাহলেও না-হয় তোমাদের অভিযোগগুলোর একটা সার্থকতা থাকত; কিন্তু আমার অভিযোক্তারা নির্লজ্জভাবে নানান বিষয়ে আমাকে অভিযুক্ত করলেও এই কথাটা বলার সাহস পায় নি যে আমি কারুর কাছ

থেকে টাকা চেয়েছি বা পেয়েছি। তারা ওই প্রসঙ্গে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আনতে পারেনি। এবং আমার দারিদ্র্যই আমার কথার প্রমাণ…' মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সামনে বিষের পেয়ালা রেখে দৃপ্তকণ্ঠে বলে চলেছেন…যারা তাঁকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন 'তাদের কাছে করুণা ভিক্ষা নয়, মনুষ্যত্বের স্থির ঘোষণা করছেন…। রাষ্ট্রের মদতে সব মানুষ যখন নেশাগ্রস্তের মত ছুটোছুটি করছে…হুমড়ি খেয়ে পড়ছে…পশুর মত ব্যবহার করছে…বৃদ্ধ মানুষকে আবার তার অক্ষের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করতেন। তাই তিনি আজ রাষ্ট্রের হাতে বন্দী, বিচারে নিন্দিত। সমাজে বিচ্ছিন্ন…কারণ তিনি তাদের সর্বশক্তিমত্তার তত্ত্বে বিশ্বাসী নন।…

বিদগ্ধ-সমাজ, সম্পদ এবং লোলুপতার শিকার…অন্তরের সম্পদ লালসায় জ্বলে গেছে…'ধর্ম' স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী হয়ে উঠেছে…ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার তত্ত্ব দুর্নীতিগ্রস্তদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার যুক্তি হয়ে গেছে…ধর্মের এই গ্লানির বিরুদ্ধে বৃদ্ধ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন…'ধর্ম'ও তাঁকে ছেড়ে দেয় নি…

বৃদ্ধকে থামিয়ে উপস্থিত নাগরিকদের একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার মত একজন সৎ, নির্লোভ, জ্ঞানী মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে এসব করলেন কেন? রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেই তো এই কাজগুলো করতে পারতেন?'

ধীর কণ্ঠে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলেন,— '…যদি আমি রাষ্ট্রনীতিতে অংশগ্রহণ করে এইসব করতে যেতাম আমি নিশ্চিত জানি, অনেক আগেই আমি বিধ্বস্ত হতাম।…বিরক্ত হয়ো না, একটা সত্য কথা বলছি শোন,…কেউ যদি দৃঢ়তার সঙ্গে…রাষ্ট্রের অন্যায়, অবৈধ অনুষ্ঠানগুলোকে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তাহলে তার জীবন দীর্ঘতর হতেই পারে না। যে ব্যক্তি ন্যায়ের পক্ষে সত্যই লড়তে চান, এবং এই কাজের জন্য অল্পকাল হলেও বাঁচতে চান, তাহলে তাকে বেসরকারী মানুষ হিসাবেই লড়তে হবে,…সরকারী লোক হিসাবে নয়।…'

॥ দুই ॥

জনৈক 'র' এসে বললো,—'সজলদা ! আমরা তো পারিনি, তুমি দয়া করে নির্বাচনে দাঁড়িয়ো না।' 'র' একসময় আমার ঘনিষ্ঠ সাথী ছিলো। প্রচণ্ড জঙ্গী ছেলে। মানুষের শত্রুর বিরুদ্ধে সে একটা দাওয়াইতেই বিশ্বাস করতো, 'শেষ করে দাও।' কলম বা ছাপা অক্ষরে তার ছিলো ভীষণ অনীহা তাই আমাদের একটু অবজ্ঞার চোখেও দেখতো। ইদানীং শুনতাম সে নাকি নির্বাচন-পন্থী একটা নকশাল দল করছে। একটা জেলার নেতা। ছোট মাথা, বলিষ্ঠ পেশীবহুল হাত-পা, চওড়া বুকের ছাতি…একটু কেমন বেমানান ধরনের ত্যারচা চোখ। ওটা যে ওর জন্মগত নয় সেটা বোঝা যেত ও যখন 'মুডে' থাকে। অবশ্যই সেই সময়টা কদাচিৎ, কখনও সখনও-ই আসতো।

সম্পূর্ণ চোখ মেলে সে কখনও পৃথিবীটাকে দেখতো না, চোখের কোন দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখতে দেখতে চোখ দু'টো কেমন রুক্ষ এবং ঘৃণায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিলো। চোখের পাতার নিচে মুখমণ্ডলের পেশীগুলো ঈষৎ ডানদিকে সরে যাওয়ার ফলে মুখমণ্ডলটাও তার স্বাভাবিক কমনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে।

'র'-এর কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না,—'কী বলছিস বল তো ? আমি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি এটা তোকে কে বললো ?'

'কেন? আমাদের পার্টির রাজ্যকমিটির মিটিঙে মিত্র বলেছে…। শুধু দাঁড়াচ্ছোই না, আমরা তোমার সমস্ত চিকিৎসার ব্যয় বহন করবো। তোমাকে কলকাতাতে একটা বাড়ি এবং ফোন দেবো…এর জন্য টাকা তুলতে বললো যে…'

'হুম !' বলে গুম হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আমি বেরুনোর আগেই পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র। কারণ বুঝতে পেরেই রহস্যভেদের পর ডিটেকটিভ বই-এর গোয়েন্দারা যেমন হাসেন, সেই রকম একটা হাসি দিলাম ! 'আরে বাবা ! নির্বাচন-ই যদি করবো তো পুরনো পার্টি ছাড়লাম কেন ?'…

'র' চুপ করে থাকে। তারপর আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলো, 'তাহ'লে ?' 'তা হলে শোন ?… ওঁরা একদিন এসেছিলেন নির্বাচনে দাঁড়াবার আর্জি এবং ফরম নিয়ে…। বললেন, 'আমরা

তলা থেকে, এবং ওপর থেকে চাপ দিয়ে বিপ্লবটা করতে চাই। এটা নাকি নতুন উদ্ভাবনী মার্ক্সবাদ !!'

॥ তিন ॥

মিত্র এবং তাঁর সাথীরা এসেছিলেন। ওঁদের প্রকৃত বাম জোটের প্রার্থী হবার আর্জি নিয়ে। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলেন। বার-বার ভবিষ্যদ্বাণী করতে করতে গেলেন....। আমার ধ্বংস অনিবার্য, ওঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না ওঁরা যে রাস্তাটার কথা বলতে চাইছেন সেটা এমন কিছু নতুন নয়।

মিত্র ঃ 'না, আমরাও নির্বাচনে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা তো এটা প্রমাণ করেছে আমরা বিচ্ছিন্ন, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য এটাকে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করবো না কেন আমরা ?'

আমি ঃ 'এই কারণেই করবো না, কারণ যারা নির্বাচন করে নিজেদের সমস্ত অন্যায়গুলোকে আইনসিদ্ধ করিয়ে নিচ্ছে, তারা জানে কমিউনিস্টরা এটা অতীতে করেছে। তাই তারা এটা করতে দেবে না। সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতিটাই সেইরকমভাবে তৈরি।'

মিত্র ঃ 'পশ্চিমবঙ্গে আজ সঠিক বামপন্থী আন্দোলনের বড় অভাব। আমরা শতধা বিভক্ত ! একটা বামপন্থী জোয়ার আনার জন্যই এটা করা উচিত !'

আমি ঃ 'এই রাজনৈতিক 'ডান' এবং 'বাম' এই কথা দু'টোই একটু অদ্ভুত জানেন ? এটা হ'ল একটা শরীরের দু'টো অঙ্গ। একটাই মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত। এটা এসেছে কোথা থেকে জানেন ? আপনি তো আবার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অধ্যাপক, আপনি নিশ্চয় জানেন...রাষ্ট্রকে একটা 'পবিত্র-গাভী' হিসাবে চিহ্নিত করে সেটার কেন্দ্রে গণতন্ত্র স্পিকার বলে একটা পদ এবং সিংহাসন তৈরী করে। এর ডান দিকে যারা থাকেন তাঁরা হলেন ডানপন্থী, বামদিকে যাঁরা, তাঁরা হলেন বামপন্থী। ডানপন্থীরা সিংহাসনটা নিয়ন্ত্রণ করেন। আপনারা কি বামপন্থী আন্দোলন বলতে এটাই বোঝাতে চাইছেন ...যে কবে ওই স্পিকারের সিটের 'বাম' দিকে যাঁদের অধিষ্ঠান তাঁরা ডান দিকে বসবেন ?...'

মিত্র ঃ 'না, না, তাহলে তোহলে তো কংগ্রেসকে বসাতে হয় ?...আমরা যারা প্রকৃত...'

আমি ঃ 'মানে, তাহলে কংগ্রেসও এ রাজ্যে বামপন্থী ? আপনারা যারা মোটেই শাসনকার্যে নিজেদের সৃজনশীল অবদান রাখতে বা প্রশাসনকে 'কল-এ্যাটেনশন' মোশানের নামে সতর্ক করে দিতে অথবা ভাগাভাগির প্রশ্নে দরকষাকষির জন্য খেউড় করতে পারছেন না...তারাই বামপন্থী বলে নিজেদের বলতে চাইছেন...এই তো ?...'

মিত্র ঃ 'না, মানুষকে সচেতন করার জন্য এই প্লাটফরমটাকে ব্যবহার করতে চাই...'

আমি ঃ (হেসে)...'এরকম দুরবস্থা আপনাদের ? মানুষের কাছে বলার জন্য, যাঁদের উৎখাত করতে চান, তাঁদের কণ্ঠস্বরে কথা বলতে হবে ? আরে বাবা ! ওখানে যেতে গেলে তো আপনাকে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে, 'আইন-শৃংখলার কাছে আত্মসমর্পণ প্রশ্নাতীত ব্যাপার। সংবিধান মেনে নিয়েই ওদের বিরোধিতা করতে হবে। আপনারা মনে করেন যাঁরা সংবিধান তৈরী করেছেন, তাঁরা তাদের অস্তিত্ব বিপন্নকারি উপাদান ওর মধ্যে রেখে গেছেন ?...এটা চরম স্টুপিডিটি নয় ?... তাই আপনাদের বামপন্থা মানে কি সংবিধান পন্থা নয় ? বামপন্থী মানে, সরকারি-বামপন্থী নয় ?...'

মিত্র ঃ 'কিন্তু বাম মানে তো বিরুদ্ধ শক্তিও হতে পারে ?'

আমি ঃ 'অবশ্যই সেটাই হবে। আর সেই শক্তি হিসাবে নিজেদের বজায় রাখতে গেলে সব সময়েই সরকারি সংগঠন এবং প্রশাসন থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে রাখতে হবে...সরকারি বামপন্থা দিয়ে বামশক্তি হিসাবে নিজেদের গড়া যায় না...'

মিত্র ঃ 'তাহলে বলতে চান যে-সমস্ত দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করে...তারা ডান হয়ে যান...'

আমি ঃ 'ডান পন্থার ভাইসেসগুলো যে সেখানে দানাবাঁধে এবং তাঁরা যে ডান হয়ে যান, সেটা তো আজকের রাশিয়া, চীন দেখেই...। এই সম্ভাবনা থাকে বলেই এঙ্গেলস এই অবস্থাতে শ্রমিক-শ্রেণীকে তার বিরুদ্ধ-শক্তির উপাদান রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে

বলেছিলেন…মাও-সে-তুং বলেছিলেন…শত্রু খুঁজে পাচ্ছেন না… (শত্রু মানে ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি)…শত্রু আছে আপনাদের মধ্যে…মানে পার্টির মধ্যে…গর্বাচভ. ইয়েলেৎসিন, লিউ-শাউ-চি… সকলেই কি কমিউনিস্ট পার্টির প্রোডাকশন নয়…?'

মিত্র ঃ— 'সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমরা এখনও সমাজতান্ত্রিক দেশ মনে করি…কমরেড গর্বাচভ একটা পরীক্ষা চলাচ্ছেন মাত্র…' মিত্রকে শেষ করতে না-দিয়েই আমি হো হো করে হেসে উঠলাম… । 'হ্যাঁ, আপনাদের বিশাল তাত্ত্বিক বইটা পড়লাম, কিন্তু একবছর পরে এখানটাই স্টিক করতে পারবেন তো… ? তখন দেখা হলে ভুল শুধরে নেবেন ?…' একটু থেমে, বললাম, 'আসলে কি জানেন ? একজন বজ্রশক্তির অধিকার-বলে ভগবান, স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর। অন্যজন 'অ্যালউর' করার জাদুর বলে শয়তান। দুজনে মিলেই আজ স্বর্গরাজ্য বা রামরাজ্য গড়ে তুলেছে…ভুলে যাবেন না নরকটাও স্বর্গ রাজ্যের অন্তভুক্ত !…'জাদু এবং বজ্র' দুটো নিয়েই তারা আজ মানুষের রাজ্যে হামলা করছে…শয়তান আর ভগবান…। আর যেহেতু মানুষ বিবর্তনের ফসল…তাই অজ্ঞানতার যুগে সে সেই-যে জাদুতে বিশ্বাস করে ফেলেছিল, সেটা তার রক্ত-মাংসে রয়েই গেছে…তাই ভগবান বজ্রশক্তি দিয়ে হামলা করার আগে… জাদুকর শয়তানকে মর্ত্য অভিযানে পাঠিয়েছে…উদ্দেশ্য ভগবানের কিছু মাল মর্ত্যবাসীদের গেলানো…এই জাদু কোথাও ইট, কোথাও ভি-সি-আর আবার কোথাও আপনাদের হাতের লাল ঝাণ্ডা… প্রকৃত মনুষ্যত্বের লাল ঝাণ্ডাকে বিরোধিতা করানোর…জন্যই আপনারা শয়তানের হাতে খেলছেন…ভগবানের মাল কাটানোর জন্য সেটাকে ব্যবহার করতে চাইছেন…মুখে বলছেন 'বামপন্থা', 'বামপন্থা'…মানুষকে অ্যালিউর করছেন, হাতছানি দিয়ে মোহাচ্ছন্ন করছেন…মানুষকে প্রবৃত্তি-সর্বস্ব করে শর্তাধীন করে তুলছেন… তাই নির্বাচন নিয়ে যত ভাবছেন, তার সিকি ভাগ সময়ও ভাবছেন না, 'ঐ রাষ্ট্র নামক দানবটাকে ধ্বংস করার জন্য বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়ে…আর সরকারি লোক হিসাবে এটা করা যায় না…সক্রেটিস সেই যুগে বসে যেটা বুঝিছিলেন, মাও-সে-তুং যেটা বুঝে, পার্টির বাইরে থেকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন।

মানে রাষ্ট্রের সরকারি-কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে··· আপনারা সেটা বুঝতে পারছেন না! এটাই আশ্চর্য!' বলতে বলতে কখন থেমে গিয়েছিলাম জানি না, কোনকালে যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মিত্র সেই ধ্যান ভাঙালেন—'তাহলে এটাই আপনার শেষ কথা?'

'এঁ্যা, কী বললেন···ও···হ্যাঁ—এটাই শেষ কথা—আসলে কী জানেন বুড়ো হয়ে গেছি। বড্ডবেশি নস্টালজিয়াতে ভুগি··· থাক কিছু মনে করবেন না,··· কেমন?'

'তাহলে উঠি?'

'আচ্ছা আসুন! না একটু শুনুন, আপনাদের কমরেডদের বলে দেবেন যদি মালিকানার প্রশ্নে কখনও ভগবান আর শয়তানে আবার দ্বন্দ্ব লাগে, যেমন কেতাবের গল্পে আছে। শয়তান বেচারা খেটেখুটে আদম তৈরী করলো, ভগবান বজ্র শক্তির জোরে বললো 'ওর প্রভু আমি'। শয়তান মানতে রাজি হল না, ভগবান তাকে নির্বাসনে পাঠালো। উঠতি শয়তান বনাম প্রতিষ্ঠিত জবু-থবু ভগবানের লড়াই শুরু হল মানুষের ওপর 'মালিকানা নিয়ে। ভগবান 'আদম'কে ভয় দেখালো, 'ঐ দ্যাখো ওটা নরক। ওই যে ব্যাটা শয়তান সে ওটা চালাচ্ছে, ওটা আগুনের দেশ, শীতের দেশ ওখানে সকলেই খারাপ···'

আজ দু-জনেই মিলে গেছে। মর্তবাসীদের এক ধাক্কাতেই··· দুজনেই মিশে গেছে···কিন্তু মর্তকে কব্জা করার পর কিংবা কব্জা করার জন্য আবার যদি ওদের ঝগড়াটা শুরু হয়···আমি কিন্তু আমার শয়তানের পক্ষে থাকব।···তখন যদি আপনি আসেন, আমাকে পাবেন···ভগবানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে কোন শয়তানের সঙ্গে আমি হাত মেলাতে রাজি আছি···যাইহোক-না-কেন ওরা তো আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফলটা খাইয়েছিল। না হলে ভগবানের শয়তানিটা ধরতাম কী করে?···আচ্ছা আসুন···! কিছু মনে করবেন না···আবার আসবেন···নমস্—না। লাল সেলাম—'।

মিত্র চলে গেলেন।···

॥ চার ॥

'এই হল আমার কথা, কিন্তু তুমি কী করে হঠাৎ নির্বাচনপন্থী

হয়ে গেলে বলো তো ?'

'প্রাণের তাগিদে, বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, রাজ্যের গুন্ডা-বদমায়েসগুলো এলাকায় জমা হয়েছে, এঁরা গিয়ে বললেন—'একটা পার্টিতে না-থাকলে এলাকার মানুষ আপনাকে খুন করে ফেলবে…সুক্তি মানে আমার বউ-ও তাই বললো। ' ভাবতে শুরু করলাম, কংগ্রেস-তো করতে পারবো না। C P I (M) করাও সম্ভব নয়। তখন ওঁরাই জেলার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন…' 'আচ্ছা 'র' বলোতো অতীতে এই গুন্ডা বদমায়েসগুলো ছিলো না ? তখন কি তুমি কংগ্রেস করেছিলে, না C P (M) করেছিলে ? তখন তুমি কী করে বেঁচে ছিলে ?' 'র' একটু হোচট খেল,—'মানুষের ওপর ভরসা করে…'

'এখন কী সেই মানুষ নেই, বলতে চাও তুমি ?'

'লোকগুলো আছে তবে সকলেই কেমন যেন সন্ত্রস্ত, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সকলেই বড় ডালে খুঁটি বাঁধতে চায় !…'

'তা তুমি নিজেই যখন সন্ত্রস্ত হয়ে এমন একটা দলে নাম লেখালে…'

'না, আমি প্রাণের ভয়ে যাইনি, বিশ্বাস করো তুমি !'

'বিশ্বাস করলাম, আর প্রাণের ভয়ে গেলেও তোমাকে খারাপ বা ভীরু ভাবতাম না। কারণ প্রাণ রক্ষার তাগিদ প্রত্যেকটা মানুষের সহজাত। এটাকে অস্বীকার করব কেন ? এটা সহজাত বলেই না, প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে, ওরা মানুষকে অবিশ্বাসী করে তুলতে পারে। একজনকে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারে।'

'আমি এদের সঙ্গে থাকব না, তুমি দেখে নিও শুধু .'

'শুধু কী ?'

একটু থতমত খেয়ে 'র' যা বললো শুনে আঁতকে উঠলাম আমি।

'গ্রামের জমিগুলো বিক্রী করে, ব্যাঙ্কলোন নিয়ে একটা বাস বার করে সুক্তিকে দিয়েই আমি বেরিয়ে পড়বো…না হলে ও বাচ্চা নিয়ে কী করবে বল ?' ওকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এই

বুদ্ধিটা কার ? আমার ছেলে-মেয়েকে দেখছ ?'

'এটা মিত্ররাই বলেছেন, ··আর আমার বউ ছেলেকে এখন কেন সাধারণ মানুষ দেখবে বল ? মানুষ সব পাল্টে গেছে এটা তুমি বুঝতে চাইছো না !'

'আচ্ছা 'র' তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে, 'তোমার কাছে C P (M) গিয়েছিলো ?' ও মাথা নেড়ে বললো—'হ্যাঁ'। আমার পরবর্তী প্রশ্ন 'কংগ্রেস ?' ও বললো 'হ্যাঁ'। 'আর মিত্ররা তোমাকে একেবারে জেলারই দায়িত্ব দিয়ে দিলেন কেন ?' ও চুপ করে গেল ! প্রশ্নের জবাব খুঁজছে মনে হল।

'তোমাকে কষ্ট করে উত্তর তৈরী করতে হবে না, আমিই বলছি শোনো। কারণ এখনও এলাকায় তোমার গ্রহণযোগ্যতা আছে। মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করেন। তাই এরা সকলেই তোমাকে চান অথচ তুমি নিজে বলছো মানুষ পাল্টে গেছে ! একটা বাঁশগাছের ডগা থেকে যদি দু'মন ওজনের একটা ভার টাঙিয়ে দাও কী হয় বলো তো ?'

'বাঁশ গাছটা নুয়ে যাবে।'

'ঠিক, ঠিক বলেছো তুমি। এবার যদি তুমি একটা ছুরি দিয়ে ভারটা কেটে দাও ?' 'বাঁশগাছটা সোজা হয়ে যাবে।' ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়···ওকে নিয়ে কী করতে চাইছি বুঝতে পারছে না এই রকম একটা ভাব। 'সেই রকমই ভারে নুয়ে গেছে এলাকার মানুষগুলো। কর্মভারে এবং ধর্ম আর প্রশাসনের ভীতির ভারে। ভুলে যেও না, ওঁরা মানুষ। মাটিতে লেগে আছেন। ভারটা শুধু কেটে দাও দেখবে সকলেই ঠিক আছেন।' ও চুপ করে কী যেন ভাবতে শুরু করে। বেশিক্ষণ সময় না দিয়েই ওকে বললাম, 'র' আর যাই করো, বাসটা কোরো না। ওটা তোমাকে মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল, তুমি গাড়ি চালাতে পারো— ড্রাইভারি করো, মাছের ব্যবসা করবে, তাই করো ? বাসটা নিও না। যাঁরা তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা তোমাকে সম্পূর্ণভাবে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান। প্রথমত ভাবো, বাসের মালিক বলেই তোমার সঙ্গে ড্রাইভার, এবং অন্যান্য বাস কর্মচারিদের একটা ফারাক হয়ে যাবে, তোমাদের এলাকায় এদের সংখ্যা কম নয়।

তারপর এই সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং গ্রুপগুলো প্রথমে ফিস ফিস করে, তারপর জোরে জোরে বলতে শুরু করবে তুমি বাসের মালিক? এত টাকা কোথা থেকে পেলে? নিশ্চয়ই পার্টির টাকা। ···তুমি কটা জায়গাতে পৌঁছুতে পারবে? ওদের সংগঠন অনেক বড়। মানুষের তোমার বা আমাদের প্রতি যে দুর্বলতা আছে, যার ফলেই তাঁরা এখনও ওদের সঙ্গে একটা ফারাক করে থাকেন, সেই বিশ্বাশ ভেঙে যাবে। ওদের দু'টো কাজ হাঁসিল হবে। এক তোমাকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। দুই, মানুষগুলোকে দলে টানা। যখনই তুমি এটা বুঝতে পারবে এবং বেরিয়ে আসতে চাইবে, ওরা তোমাকে খুন করবে। 'র'···তুমি খুন হবে·· কারণ তখন আর তোমাকে রক্ষা করার মত কেউ থাকবে না···'

'সজলদা, আমি জঙ্গী ছিলুম, সাদা-সিধে ছিলুম, মানুষকে ভালোবাসতাম ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারতাম না,···আজকে তোমার কথা শুনে সেটা আবার মনে হচ্ছে · '। 'র' কথা বলতে পারছে না, উঠে দাঁড়িয়ে মুখটা ঘুরিয়ে বেরিয়ে আসতে চাওয়া আবেগকে চাপার চেষ্টা করতে থাকে···। 'চলি আজ? তোমার কথা মনে থাকবে? দেখি সুক্তি কী বলে?'

॥ পাঁচ ॥

'কে গেল! ''র···র···'' না?' কথা বলতেই স্বনামধন্য প্রভাত সেন ঢুকলেন তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তখনও র-এর চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে আছি। সেই দিকে তাকিয়েই বললাম, 'হ্যাঁ, সেন, একটা সুন্দর ছেলেকে খুন করার রাজনৈতিক পটভূমি তৈরী হতে দেখছি। হাত-পা বাঁধা, কিছু করতে পারছি না। চিৎকার করে বলতে পারছি না ··'খুন করে গুন্ডারা কিন্তু তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয় এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো।···'

'আর ইউ আ বিট্ আপসেট? কী ব্যাপার বলো তো?' প্রভাত জিগ্যেস করে।

'আ বিট্ নয়, আ লট,' বলে ওকে সবিস্তারে 'র'-এর ঘটনাটা বললাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে প্রভাত বললো—'এ তুমি আর কত

সামলাবে? সর্বত্রই এই জিনিস চলছে। লেখা কেনার আগে লেখক কেনা, সংগঠন গড়ার চেয়ে সংগঠক কেনা, সব ঠিক হচ্ছে কাঞ্চনমূল্যে। অস্বীকার করবে? খুন হবে! ' একটু থেমে সে বলতে থাকে—'কী অখাদ্য সব লেখা বেরুচ্ছে·· আর আর তাঁরাই হচ্ছেন বেস্ট-সেলার! যেহেতু তাঁরা একটা পেপারহৌস-এর লোক!···'

'বাদ দাও ওসব কথা···যা হয় হবে, এবারের এই বন্যার ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'কী বলবো বলো? কতদিন সরকারি লোকদের বোঝাবার চেষ্টা করছি ফারাক্কার ফিডার ক্যানেলটার কাজ শেষ করবে···'

'কিন্তু ডাঃ মেঘনাদ সাহা····',

'ওঃ আপনি মেঘনাদ সাহার কথা বলছেন···' আমাকে থামিয়ে প্রভাতের গিন্নী সুস্মিতা, না কী যেন নাম, বলে উঠলেন 'ওঁর নাতি আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, কত গেছি ওদের বাড়ি। সুজয়ের বাবা তো আমাকে বউ করবেন-ই। আমার বাবা বললেন···'

প্রভাতের দিকে তাকিয়ে দেখি মাথা নিচু করে একটার পর একটা কাগজ ছিঁড়ছে। আমি ব্যাপারটা বোঝার এবং পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য বললাম—'গিরীন্দ্রশেখর বসুর বইটা জোগাড় করতে পেরেছ প্রভাত?' উত্তর দিলেন ওঁর গিন্নী, 'রাজশেখররা তিন ভাই, আমার বাবার তো প্রতিদিন ওখানে গিয়ে দাবা না খেললে চলতো না'···এবার একটু বিরক্ত হ'লাম। মহিলাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'বিচিত্র সব ব্যাখ্যা, নয় বলো?' প্রভাত সরাসরি এবার জবাব দিল, 'কী যে বলতে চান বোঝা গেল না। ত্রি-স্তর মনের একটা ব্যাখ্যা তবু ফ্রয়েড দিয়েছেন, স্বপ্নেরও একটা ব্যাখ্যা পাই, কিন্তু উনি কী বলতে চাইছেন বলো তো?'

'বলবেন আবার কী, সেই ইড, ইগো, সুপার-ইগো, স্বপ্ন হচ্ছে 'ইডে'র স্বাধীন বিচরণ যেগুলো 'ইগো' চেপে রাখে ··তার থেকেও মজার কী কথা জানো? বিভিন্ন পেশার প্রতি অনুরাগেও ফ্রয়েড সাহেব যৌন তৃপ্তির লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। ভাস্কররা যে মণ্ড ঘাটেন, কিংবা কাদা দিয়ে মূর্তি তৈরী করেন তার কারণ হলো ···ওঁরা আসলে পায়ুকামী। পায়ুকামের ইচ্ছাটা অবমিত হয়েছে।

কিন্তু নোংরা ঘাঁটাটা রূপ পেয়েছে কাদা ঘাঁটাতে··· ভাবো তো রামকিংকরকে কেউ এই কথা বললেন ?···'

'আহা ! তুমি ভুল করছো সমরেশ বসুর শেষ লেখাটাতে দেখলে না, জোড় লাগা সাপ দেখে মাটি দিতে আসা সাঁওতালি মেয়েটার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে এবং 'বুলতে' শুরু করলো···'

'সমরেশ বসু ! আমার দিদি বাংলা অনার্সের ছাত্রী · সমরেশ বসুর কাছে একদিন···' প্রভাত-গিন্নীকে এবারও আমি চুপ করালাম। বিড়ম্বিত প্রভাত কী যেন বলল ওনাকে। ব্যাস তুলকালাম কান্ড। শুনতে হল সাত কাহন, ওঁর বাবা কে ? কত বড়, কত কত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ছিল, তাঁর থেকে বড় পন্ডিত ঐ ভূভারতে আর নেই, ঠাকুরদা ছিলেন কী মহান, কে কী বলেছেন তাঁর সম্পর্কে। প্রভাতের আলোতে উনি মোটেই আলোকিত নন, উনি স্ব-পরিচয়েই দেদীপ্যমান। ইত্যাদি···, বেচারা প্রভাত লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে আছে, প্রভাতের মুখে এই মহিলার কত কথা শুনেছি !

বাধ্য হয়েই বললাম, 'শুনুন ম্যাডাম, আপনার কে, কী সেটা তো আমি জানি না, শুধু আমি কেন, আপনাকে যেখানে যেখানে তোল্লা দেওয়া হয় তাঁরাও জানেন না, তাঁদের সকলের কাছেই এবং আমার কাছে তো বটেই আপনার পরিচয় আপনি প্রভাতের স্ত্রী এবং তার সাথী।···'

মহিলা ফোঁস করে উঠে চুপ করে গেলেন। এবার সরাসরি ওনার দিকে তাকালাম। সাধারণ বাঙালি মহিলাদের থেকে মাথায় একটু উঁচু হবেন বলেই মনে হল। এক কথায় সব মিলিয়ে বেশ সুন্দরী। কমনীয় মুখমণ্ডল। এত দারিদ্র্য আর ঝড় ঝাপটাও সেই কমনীয়তা নষ্ট করতে পারেনি, কিন্তু টানা বড় বড় চোখ-দুটোতে অসম্ভব ক্রূরতা ! চমকে উঠলাম। 'এটা কী করে হয় !' আমাকে বিড়বিড় করতে দেখে মহিলা জিগ্যেস করলেন,—'কিছু বলছেন ?' কথা বলার সময় অত সুন্দর টানা টানা চোখ দুটোকে অদ্ভুত কায়দায় কোটরে টেনে এনে গোল গোল করে ফেলেন। মণিদুটো বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে থাকে। মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হয়ে চোখের নীচে জমা হয়। মুখ দিয়ে উচ্চারণ এবং

চোখ দিয়ে হিস হিস শব্দ বের হয়। গা-টা ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে। চামড়ার নীচে দিয়ে বয়ে যায় একটা শির-শিরে ভাব, বললাম—'ম্যাডাম আপনি চুপ করে থাকলেই আপনাকে বেশি সুন্দরী মনে হয়!'

'আমার বাবা আমাকে চুপ করাতে পারে নি। আর উনি কে? আপনি যেই হোন…'

'আহাঃ এই আধঘণ্টার মধ্যে অন্তত পঁচিশবার শুনলাম, আপনার বাবার কথা। তা আপনার বাবার বাবা কী ছিলেন?'

'ডাক্তার।'

'তাঁর বাবা?'

'জমিদার। ঢাকার, এখনও…'

'থাক থাক, তাঁর বাবা?'

প্রভাত গিন্নী চুপ করে গেলেন, 'বলতে পারলেন না তো? পারবেন না জানতাম। কেউই পারবে না। কিন্তু এমনি করে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে গেলে, যদি জিগ্যেস করা হয়? ডারউইনের দৌলতে সকলেই বলতে পারবেন—'পশু'। সুতরাং বুঝতে পারছেন আমাদের কয়েক হাজার বছর আগের বাবারা 'পশু' ছিলেন। এসেন্সিয়ালি আমরা সকলেই পশুর বাচ্চা। তাই মাঝে মাঝে আমরা পশুর মত ব্যবহার করে ফেলি। বাবা, ফাবা নিয়ে অত বলার কী আছে? নিজে কী সেটাই ভাবুন!' 'আপনি আমাকে জানোয়ারের বাচ্চা বললেন!' রেগে উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'এই তুমি থাকবে তো, থাকো! আমি চললাম!' প্রভাতকে উনি নির্দেশ দিয়ে পা বাড়ালেন। আমি ওনার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলাম।

প্রভাতের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে বলল, 'সর্বনাশ করলে! এর জের যে কতদিন চলবে?' ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'অত ঘাবড়াবার কিছু নেই, এই সমস্ত মহিলারা সতী হবেন না, অসতীও হবেন না, আবার পতিও ছাড়বেন না! এ-এক অদ্ভুত মানসিকতা! যার মূল আছে ওদের পরিবারে।'

'ওফ্! তুমি বড় হার্শ কমেণ্ট করে! ওর দৃঢ়তাটা একেবারে উড়িয়ে দিও না…'

'দেখো, ওর এই প্লাস পয়েণ্টটাই ওর মাইনাস পয়েণ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু একটা বিশাল ঝড় প্রায় একা মোকাবিলা করেছে…তাই ও সবসময়ই ভাবে তোমার থেকে ও কম কিসে? এখন এত লোক তোমাকে সম্মান করেন, ওনার মনে হয় এগুলো সব ওনার প্রাপ্য। তুমি ফলস-ক্রেডিট নিচ্ছ। উনি অবহেলিত অথচ কোন যোগ্যতা নেই…আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা…অযোগ্য মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে সমূহ বিপদ…অন্য মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে থাকে · হয় একটা লেডি ম্যাকবেথ, হিটলার কিংবা যুবরাজ সঞ্জয়!…'

'কিন্তু ওর সেই একা একা লড়ে যাওয়াটা…' প্রভাতের কথা শেষ হবার আগেই বললাম, 'অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তোমার দৃঢ়তা এবং নির্যাতনের সঙ্গে একটু ফারাক আছে বৈ কী!'

'কেন?'

'কেন? নিজের বাছুরকে বাঁচাবার জন্য অনেক সময় একটা গরুকেও দেখা যায় একা হিংস্র বাঘের সঙ্গে লড়ছে সন্তান-সন্ততির অস্তিত্ব বিপন্ন দেখলে, প্রত্যেকটা জীবই নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে থাকে। কিন্তু মানুষ শুধু এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যকে বিপন্ন দেখলে, অন্যের ছেলেমেয়ের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখলেও সে ঝাঁপিয়ে পড়ে…। উনি যা করেছেন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য…কিন্তু সেটা ওই গরুর মতই। বাঘ চলে গেলে বাছুর বড় হয়ে গেলে গরু আর তাকে চিনতে পারে না। এঁরাও পারেন না, তখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নিজে কোন অন্যায় করে ধরা পড়লে, জোর গলায় চেঁচাতে থাকে। যার প্রতি সেই অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই দোষটা তার ওপর চাপাতে পারছে, স্বস্তি নেই…এদের এই চরিত্রের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতা। বুর্জোয়ারা দেখছো না, নিজেদের চারিত্রিক অন্যায়গুলো সমাজতন্ত্রের ওপর চাপিয়ে কী রকম চালাচ্ছে।…আর তাছাড়া উনি তো লড়েছেন…তোমার মত একটা বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায়, তোমার নামটাই ছিল একটা ছাতা। কতকটা মায়ের কোলে থাকা বাচ্চা ছেলেটার সিংহকে লাথি দেখানোর মত…

'না, না, তুমি অত ছোট কোরো না ওকে…'

'ওরে বাবা! না, তোমার বউকে ছোট করছি না। এটা সাধারণ ভাবে এইসব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য! ইঁদুর থেকে মুনির বরে ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত এইসব চরিত্র, নিজের আসল চেহারা লুকোবার জন্য মুনিকেই লোপাট করে দিতে চায়.... !' দীর্ঘক্ষণ বক বক করে একটু থামলাম। সেই ফাঁকে প্রভাত বললো, 'অদ্ভুত ব্যাপার! প্রায় জ্যোতিষীর মত তুমি সব বলে গেলে...কিন্তু তবুও একটা কথা এগুলোর জন্য কোন একটা ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় না, এটা যুগের বৈশিষ্ট্য; মূল্যবোধের সংকট! ইট'স টাইমস প্লেগ! যুগের মড়ক! তুমি, আমি কেউই বাঁচবো না এই ঝড়ের হাত থেকে ' ওর গলায় একটা হতাশা!

'প্রথমটার প্রথম অংশ ঠিক বলেছ, কিন্তু কমরেড, সংকটটা মূল্যবোধের নয়, এটাই হচ্ছে সংকটকালীন মূল্যবোধ! সত্যিই 'যুগের মড়ক লেগেছে বন্ধু, যুগের মড়ক/যখন অন্ধ নিয়েছে দায়িত্ব, খোঁড়াকে দেখাবে পথ!' এত হতাশ হবার কী আছে! আমি, তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে পারি কিন্তু তবু মানুষ থাকবে, নর-পশুদের দাপাদাপি সাময়িক কারণ মানুষ যে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেয়েছে।...'

'তোমার শরীর খারাপ লাগছে না তো? একটু জল খাবে?' প্রভাতের কথাতে একটু ম্লান হাসলাম...'কতদিন শুধু এই কথাটাই শুনিনি জানো? এখনও তো এই কথাটা বেঁচে আছে...সুতরাং মানুষে মানুষে সম্পর্ক কী করে ওরা ধ্বংস করবে বলো তো?...' বালিশে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বললাম, 'বুঝলে প্রভাত জরাগ্রস্ত পুরনো মূল্যবোধ প্রাকৃতিক নিয়মেই তার অচলায়তনিক ব্যবস্থা-শুদ্ধ ধ্বংস হয়ে গেছে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি...সংকট এটাই...' আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রভাত শুরু করে ঃ—

কোথাও পাবে না কিছু;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।
আমি তবু বলি;
এখন যে-কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস

সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্য তার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জল ঝর্নার ধ্বনি।

আবৃত্তি থামিয়েই প্রভাত উঠে পড়ে। আমি শুয়েই থাকি। কানে বজেছে ··

'নিষ্পেষিত মনুষ্য তার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক···'

সুন্দর মানব শিশু থেকে বীভৎস মানবী—কে দায়ী

॥ এক ॥

'এই সুসী! এদিকে আয়!' জাঁদরেল কাকার ডাকে এক মাথা ঝাকড়া চুলওয়ালা রোগা মেয়েটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এই বাড়ির অবস্থা এবং অবস্থানের সঙ্গে এক্কেবারে বেমানান একটা ফ্রক পরা আছে। ফ্রকের একটা খুঁট চিবুতে চিবুতে সে ভাবছে—'কী ব্যাপার! কাকু হঠাৎ ডাকছে কেন?' ভাবার কারণও আছে যথেষ্ট। কাকু ডাকা মানে···'কই এলি?'—ওপর থেকে আবার নির্দেশ। কী করবে সে! পা-যে চলতে চায় না। ছুটে পালাবে? কোথায় যাবে?

'যা, না, আজ তোর হবে!' পেছন থেকে প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো বোন এক ঠ্যালা মারে। হুমড়ি খেয়ে সিঁড়ির ওপরেই পড়ে যায় ছোট্ট মেয়েটা, কেউ তোলে না। কেউ এগিয়ে আসে না। চোখের কোনটা সিঁড়ির কোনা লেগে ফেটে যায়। হাত দিয়ে সেই রক্তটা মুছে, ফ্রকের কোনটা চেপে ধরে। রক্ত দেখে যদি কাকুর মন গলে এই ভেবে সে চিৎকার করে ওঠে, 'কাকু! দোলা আমাকে ঠেলে ফেলে রক্ত বার করে দিয়েছে।' ঘরের ভেতর থেকে কাকুর হুংকার, 'তোকে ডাকছি তুই আয়! কেটে দিয়েছে!' একটা

বিকৃত ভ্যাংচানির আওয়াজ, 'সুন্দরীর মুখে দাগ হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি আয়! এই দোলা! ধরে নিয়ে আয় তো ওকে!' সুসী বুঝতে পারে কাকু চারতলার ঘরটাতে পায়চারি করছে…।

উত্তর কলকাতার একটা অভিজাত বাড়ির রোজগেরে ছোটবাবু বাড়ির মানসম্মান বজায় রাখার জন্য ফুঁসছেন। তিন ভাই তাঁরা। বড়জন পাশ করেছেন ডাক্তারি, কিন্তু কোন পসার নেই। বাড়ির কর্তা। মেজজন কী যে করেন কেউ-ই জানে না। টাকা ছাপিয়ে যান, গোছা গোছা টাকা আনেন রেস খেলেন। যা টাকা আনেন ঢেলে দেন ছোট'র হাতে। বড় নির্বিকার। সংসার চলে পৈত্রিক আয় থেকে। একাধিক বাড়ির ভাড়া থেকে·· তিনি সারাদিন পড়েন …বিকেলে কয়েক মাইল হেঁটে দাবা খেলতে যান। নিজের দুই মেয়ে নিয়ে থাকেন তিনতলার একটা ঘরে…রহস্যজনকভাবে স্ত্রী মারা যাবার পর একেবারে উদাসীন। ছেলেমেয়েরা কী খেল, কাদের তত্ত্বাবধানে আছে কোন খোঁজ খবরই রাখেন না। মা-হারা এই তিন ছেলেমেয়েকে কিন্তু পাড়ার লোকেরা খুব ভালবাসে… খুউব। তারা বলে 'দে বাড়ির তিনটে ফুল!' দেবশিশু! হবে না, বাবা কেমন!' এসব কথা কানে আসে ছোট গিন্নীর। ফুঁসতে থাকেন, নিজের মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন, 'কী ছিরি! যতই খাওয়াও ওই সুসীর রূপের ধারে কাছে যেতে পারছে না! 'এত ভালভাল জামা কাপড় দিই! মেয়ের রূপ খোলে কই! সুসীর ধারে কাছে যেতে পারে না।' কেউ তাদের যত্ন করে না। আট বছরের মেয়ে এরই মধ্যে পিঠ ভেঙে চুল যেন চুলের ঢল! কী খায় ওরা! গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে! একটা শতচ্ছিন্ন ময়লা ফ্রক পরেই কী সুন্দর লাগছে!' নিজের মেয়ের দিকে আবার তাকান তিনি, 'ছিরি! দ্যাখো না মেয়ের! ঐ মেয়ে থাকতে কেউ একে পছন্দ করবে এ বাড়িতে এসে!' মেয়েকে ডাল-বাটা, দুধের সর মাখাতে হবে। ভাসুরের কাছে যান, সংসারের মেয়ে, তার রূপ-চর্চার খরচ সংসারকেই দিতে হবে। ছোট বউমা ডাকেন…'দাদা!'

কী একটা হিসাব কষছিলেন তিনি। মুখ না তুলেই জবাব দেন' 'হুম, কেন?'

'আমার দোলার জন্য দু-সের দুধ বেশী আনতে হবে!'

ছোট বউমার দাবী শুনে এবার মুখ তুলেন তিনি, অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, 'কেন ? ও কি দুধ পাচ্ছে না ? ওর কি শরীর খারাপ ?'

'না রান্নার মাসি, দোলাকে অল্প, অল্প দুধ দেয়…' বউমার কথা শুনে রাগে চিৎকার করে উঠেন কর্তা, 'কী এত বড় কথা ! ডাকো তো তাকে !' এমন সময় সুসী বলে ওঠে, 'না গো বাবা, কাকিমা মিথ্যা বলছে ! দুধ তো কাকিমা নিজেই দেয়। তিনদিন ধরে সব দুধ তো কাকিমা নিয়ে উপরে চলে যাচ্ছে। আমি, দিদু, এমন কি ভাইটাও পায় না। ভাই-এর জন্য কাল একটু দুধ চাইলাম, কাকিমনি বললো, 'যা, যা, যার মা থাকে না, তাদের দুধ খেতে নেই !' বাড়ির কর্তা একবার ছোট বউমার দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে আবার হিসেব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'মানি, আন-এক্সপেন্ডেড ইজ মানি সেভড, বুঝলে বউমা !' মুখ তুলে দেখেন ছোট বউমা নেই। পাশে বসে আট বছরের মেয়েটা, একটু আদর করতে ইচ্ছা করে। 'না, না, এসব দেখানো চলবে না ! আদরে ছেলে মেয়ে বাঁদর হয় !' কিন্তু মা-মরা মেয়েটার আদর পেতে ইচ্ছা করে। সে বাবার গা-ঘেঁষে বসতে চায়, 'যা, এখানে কী করছিস ওঠ !' ঠেলে তুলে দেন তিনি। অভিমানে বুক ভারি হয়ে ওঠে। কী যেন একটা বুক বেয়ে গলার কাছে এসে আটকে যায় ! বলতে পারে না। শুধু মনে হয়…'কেউ যদি একটু বুকে চেপে মাথাটাই হাত বুলিয়ে দিতো ! যেমন মা করতো·· বিছানায় বালিশে মুখ বুজে কাঁদতে থাকে সে ! বাবা হকচকিয়ে যান। ধমক দিয়ে ওঠেন, 'যা, ওঠ ! কাঁদার কী হল ? ভাই কোথায় দেখ !' বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে। ভাই-এর খোঁজে ছাদে যেতে গিয়ে কাকুদের ঘরের দিকে নজর পড়ে, থমকে যায় মেয়েটা, 'কাকু অফিস থেকে ফিরেছে। দাদামণি, দোলা, কাকু মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে খাচ্ছে। কাকিমণি খাবার দিচ্ছে, মিষ্টি, আম,…কাকিমনি দোলাকে বার বার বলছে, 'একটা সন্দেশ খা…' ওখান থেকে পা নড়তে চায় না। তার চোখ চক চক করে। না, খাবারের লোভে নয়। কিসের লোভে সে জানে না। সে এই দৃশ্য গিলতে থাকে…

"ও মা ! ঐ দ্যাখো ! দরজার ফাঁকে হ্যাংলা সুসীটা দাঁড়িয়ে আছে ··ঈস ! দৃষ্টি দিয়ে দিলো !' দাদামনির চোখ পড়ে যেতেই

সে চিৎকার করে তার মাকে জানিয়ে দেয়, কাকু চিৎকার করে ওঠে,···'এই ওখানে কেন রে ! সারাদিন অপিস করে এসে একটু নিশ্চিন্তে খাবারও উপায় নেই !' উনি উঠে পড়লেন, আট বছরের মেয়েটার মনে হল 'মাটিতে মিশে যাই !'

'মা ওকে একটা সন্দেশ দাও না !' দাদামণির আব্দার !

'না, না, অত দয়া দেখাতে হবে না তোমাকে !' মায়ের ঝাঁঝালো উত্তর উপেক্ষা করেই দাদামণি একটা তালশাঁস সন্দেশ সুসীর দিকে বাড়িয়ে দেয়,—'এই নে খা। দাঁতে দাঁত চেপে সুসী ঘাড় নাড়ে, "না" ওর 'না' বলার ধরনটাতে কী যেন ছিলো হঠাৎ কাকু উঠে এসে হুমকি দিলো, 'খা! খেতেই হবে তোকে।' কাকুর হুমকিতেও সুসী এক পা নড়ে না, হাতটাও বাড়ায় না। 'এই, কান্ত ধর তো ওকে !' ছেলেকে নির্দেশ দিয়েই উনি হুকুম দিলেন—'খেতেই হবে ওকে !'

ছেলে-মেয়ে দুটো মজার খেলা পেয়ে সুসীকে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে যায়। কাকু, কাকিমণি মজা পায়। ওরা জোর করে ওর মুখে সন্দেশটা গুঁজে দেবেই। দাঁতে-দাঁত চেপে সুসী প্রতিরোধ করে। সন্দেশটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে সমস্ত মুখ মাখামাখি।

'আমার জামা নষ্ট করলে কেন ? কে কেচে দেবে এবার ?' ফোঁস করে ওঠে সুসী। তার দু-চোখ ভর্তি জল। এখন গিয়ে জামা কাচতে হবে, এই একটাই জামা, কাল আবার স্কুল ! 'এই যে, আর একটা ! ওকে শুইয়ে ফেল !' দোর গোড়া থেকে কাকু নির্দেশ দেন। ছেলে মেয়ে দুটো নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুসীকে পেড়ে ফেলে কাঁকরভর্তি ছাদে। দোলা ওর হাতটা চেপে ধরে। কান্ত মানে সুসী যাকে দাদামণি বলে ডাকে সে ওর বুকের ওপর বসে মুখটা হাঁ করানোর চেষ্টা করতে থাকে। প্রতিরোধের শেষ চেষ্টাতে মাথা নাড়ায়। কনুই দুটো ছড়ে যায়। মোমছাল উঠে গিয়ে জ্বালা করতে থাকে।

দূরে সন্ধ্যা নেমে আসে। চারতলার বাতাসে ধূসর আলো। ডুবন্ত সূর্যের রক্ত-ফোটানো রঙের রশ্মি কলকাতার বাতাসের ধোঁয়াশা ভেদ করে আসতে গিয়ে আরও ধূসর হয়ে ওঠে। সামনের পার্কটাতে পাখির বাচ্চারা মা-বাবার কাছ থেকে দাবী করতে থাকে,

'রাতের খাবার দাও!' তাদের কিচির-মিচির শব্দ। সুসী একবার তাকিয়ে দেখার জন্য ঘাড়টা নাড়ে। মনে ভাবে, 'কাল একটা শালিকের বাচ্চা ধরতেই হবে!'

'অপদার্থ সব! এত যে গেলাই যায় কোথায়?' কাকিমণি গজগজ করতে করতে এসে সুসীর চুলের মুঠি চেপে ধরে। ওর দাঁত দু-পাটি আবার দেওয়াল তৈরী করে। পাখির বাচ্চাটা লাল টকটকে হাঁ করে; মা তার মুখে খাবার গুঁজে দেয় ঠোঁটে করে। এদিকে একটা মানুষের বাচ্চা আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁটটা বন্ধ করে দেয়।··

'হুম! লম্বা, লম্বা চুল! দেবশিশু!' কাকিমণি এক হ্যাঁচকাতে ওর মাথা থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নেয়। মাথাটা জ্বালা করে। মুখে একটা "মাগো!" শব্দ করে আবার দাঁত চেপে পড়ে থাকে সে। এই সন্দেশটাও ভেঙে গুঁড়ো···'ওর মুখটা আঁচড়ে দাগ করতে পারছিস না!' সন্তানকে মায়ের নির্দেশ। হতাশ দাদামণি, মাকে বোঝানোর জন্য দু'টো হাত তুলে দেখাল, 'একটাও নখ নেই যে আঙুলে, সব তো নির্মূল করে দিয়েছ।' পশুদের নখের প্রয়োজন হয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষেরও! সর্বগ্রাসী মানুষদের নখ লাগে সুন্দর মুখকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য। সুন্দর হৃদয়ে বেঁধানোর জন্য। রক্ত ঝরানোর জন্য। নিজের পালিশ করা করা হাতের নখগুলো দেখে কাকিমণির আপশোস হয়, 'ইস! কান্তটার একটা নখ থাকা উচিত ছিল।' মাকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য দোলা যেই নিজের হাত দুটো দেখিয়ে বলতে গেল, 'আমার আছে মা, আমি দোবো!' এক ধাক্কাতে সুসী দুজনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে নীচে নেমে যায়।

বাবা তখনও কী একটা হিষেব কষছেন। এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার কোলে, 'আঃ কেউ যদি একটু আদর করে! মাথাটায় হাত বুলিয়ে দেয়! বিরক্ত হয়ে ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, 'আঃ একী আবার! সরো সরো!' দূরে সরে যায় মেয়েটা। একটুও কাঁদে না। কিচ্ছু বলে না। আগুন জ্বলতে থাকে চোখে।

'দাদা! দেখুন! সুসী কান্ত আর দোলাকে ছাদ থেকে প্রায় ঠেলে ফেলেই দিত।' ছোটভাই-এর অভিযোগ শুনে মুখ

তুলে তাকালেন তিনি।

'এই সুসী!' বলেই তাকিয়ে ক্ষত-বিক্ষত সুসীকে দেখলেন। 'একী তোর এরকম অবস্থা হয়েছে কেন? ইস্ কনুই দু'টো যে ক্ষত-বিক্ষত। দেখি, দেখি।' ডাক্তারবাবু কনুই দেখতে গিয়ে হঠাৎ মেয়ের মাথার খানিকটা চুল-শূন্য জায়গা দেখে ফেললেন, 'এ কীরে তোর টাক পড়ছে না কি!' পরীক্ষা করার জন্য হাত ঠেকাতেই মেয়েটা আর্তনাদ করে ওঠে।

'এ কী রে! এত চুল! এযে সমূলে ছিঁড়ে নেওয়া · !' ডাক্তারী বিদ্যাতে কোন ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না। একবার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ভাই-এর দিকে তাকান। দাদাকে তাকাতে দেখে তিনি বলে ওঠেন, 'আপনি ওকে বাঁদর তৈরী করছেন দাদা! ওকে অত আস্কারা দেবেন না!' বলতে বলতেই তিনি চলে যান।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন, বড় হচ্ছে মেয়েটা। রাত এখনও নামে নি। সমস্ত আবেগ দিয়ে মেয়েকে চেপে ধরেন! 'কী হয়েছে রে সুসী!' কান্না চেপে ভারি গলাতে সব বলে যায় সে। 'হুম! চল,' বলে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে ফার্স্ট-এইড্ বক্স নিয়ে বসেন! এত ধ্বস্তাধ্বস্তিতে যে মেয়ের মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ বেরোয় নি। এবার সে চিল-চিৎকার জুড়ে দিল। বাবা ড্রেস করতে থাকেন। মেয়ে চিৎকারে। রাতের অন্ধকার এখনও নামে নি···পার্কের ওপরের চাঁদটা মায়া-মাখানো আলো ছড়াচ্ছে। ঠেকিয়ে রাখছে অন্ধকার। ঘরের ঝুল-বারান্দায় বসে ডাক্তারবাবু দেখেন সেই দৃশ্য। 'এই সুসী! ওইগুলো নিয়ে আয় তো!' মেঝেতে বসেই হিসাবের খাতা দেখতে থাকেন···'এই যে, বই-এর টাকাটা জোড়া হয় নি। দশ হাজার···পাঁচশ তিনভাগ ··।' মুখ তুলে দেখেন সুসী তখনও বসে। একটা মেঘ এসে চাঁদকে গ্রাস করে। গাছের তলায় জমাট অন্ধকার! ঘরেও অন্ধকার জমাট বাঁধে···' বুঝলি সুসী! আ পেশেন্ট ইথারাইজ্‌ড্ আপন আ টেবিল' সুসী হাঁ করে থাকে।

'সার্জনের উদ্যত ছুরির সামনে অজ্ঞান করা রুগীর মত আমার অবস্থা বুঝলি!' মেয়েকে কথাগুলো বলেই তিনি নিজের

আয়ত্ব করা বিদ্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন,—'না, না, বুঝলি সুমী আমাদের ধ্বংস হতেই হবে! এ তার অভিশাপ!' মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসে··· । ডাক্তারবাবু হিসাব করেন··· 'দশ হাজার পাঁচশ' ···বাড়ি মেরামতি খাতে যাবে···'

হিসাব বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর। সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে। কেউ ছাড়বে না। আহত, রক্তাক্ত মেয়েটার দিকে একবার তাকান! বাবার পাশেই সে বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আক্রান্ত শিশু ঘুমের ঘোরে। কী ভাবছেন বাড়ির কর্তা? হিসাব মিলিয়ে দিতে হবে। সব হিসাব। মেয়েটা যন্ত্রণায় গোঁঙাতে থাকে। যন্ত্রনাবিদ্ধ বালিকা। স্বপ্নে বড় হয়। হিসাব বুঝে নিতে চায়? পকেট ঘড়িটা ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে দেখেন, 'রাত ১১টা।' 'ইস! ওদের পড়তে বসার সময় হয়ে গেছে না!'

বাড়ির সকলে যখন খেয়ে দেয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছে। উনি তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়তে বসান! এটা দৈনন্দিন ঘটনা। এতে সকলেই অভ্যস্ত। খাবার ঢাকা থাকে একতলার ঘরে টেবিলে! এবার তিনি তিন ছেলেমেয়েকে টেনে হিঁচড়ে তোলেন। তিনি বলেন বাচ্চাগুলোও এতেই অভ্যস্ত। শিশু বুকে কান্না জমতে থাকে দে-দের বিশাল অট্টালিকার আড়ালে চলে গেছে চাঁদ····তিন মানব শিশু পড়তে বসে···পার্কে ঘন ছায়া···নেমে আসে। ঝুল বারান্দাতে জ্বলছে একটা উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্প—ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে তিন মানব শিশু ভবিষ্যৎ গড়ছে···দূরে হঠাৎ ঘুম ভাঙা কোন পাখির কর্কশ চিৎকার ডাক্তারবাবুর কানে এলো···· । কানে এলো, 'ধ্বংস হতেই হবে!' চমকে উঠলেন তিনি।···

'সব দেবতার আদরের ধন নিত্যকালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সি।
তুই জগতের স্বপ্ন হতে এসেছিস আনন্দস্রোতে
নতুন হয়ে আমার বুকে বিলাসি।—'

'বাবা এটার ব্যাখ্যা কী হবে?' বড় মেয়ের ডাক শুনে চমক ভেঙে ডাক্তারবাবু বইটা টেনে নেন। আবার হারিয়ে যান।

'ও বাবা! কী হল?' মেয়ে তাড়া দেয়···

'ওঃ হ্যাঁ, লেখ—' উদ্ধৃত পঙক্তিগুলি কবিগুরুর…'।

'থাক্ লিখতে হবে না—'

তিন ভাই বোন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, 'বাবার হলটা কী?' আজ তিনি পড়াতে পারেন না।

হিসাব কিছুতেই মিলছে না। রয়ালটির টাকাটা…জোচ্চুরি করেছে…।

॥ দুই ॥

কাকু পায়চারি করছে ওপরের ঘরে। অর্ধেক সিঁড়ি উঠে সুসী থমকে গেছে। একটা খসখস আওয়াজ আর পাখা-ঝাপটানোর শব্দ শুনে সিঁড়ির ওপরের ঘুলঘুলির দিকে তাকিয়ে দেখে পাড়ার বে-ওয়ারিশ মাস্তান ভুলু পায়রা বাচ্চা ধরার জন্য গুটি গুটি এগুচ্ছে। বাচ্চাদের বাবা-মা পাখা-ঝাপটিয়ে তাকে প্রতিরোধ করছে। বিড়ালটা ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করছে কিন্তু তার এগিয়ে যাওয়ার গতি থমকে গেছে। সুসী ভুলে গেল এ-বাড়ির ছোটবাবু নামক জাঁদরেল লোকটা তাকে ডাকছে। হাত নেড়ে সে কয়েকবার 'হুস' 'হুস' শব্দ করলো। তাতে বিড়ালটাতো সরলোই না, বরং পায়রাগুলোই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। একটা ইটের টুকরো কিংবা লাঠির খোঁজে সে যখন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে এমন সময় দাদামনি এসে তার হাতটা চেপে ধরে—'কী রে! বাবা যে এতক্ষণ ডাকছেন খেয়াল নেই! চল!' দাদামনি ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

সুসীকে দেখেই ওর কাকু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে উঠলো,—'কী মহারানি। কীসের এত দেমাক শুনি, এতক্ষণ ধরে ডাকছি শুনতে পাচ্ছেন না!' সুসীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ওর চুলের মুঠি ধরে ঠেলে দিল খাটের দিকে। ছত্রির কাঠে মাথাটা ঠুকে যায়। 'আঃ' একটা শব্দ করে ও চোখ দুটোকে গোল করে সোজা কাকুর দিকে তাকায়। আবার কিছু একটা করার জন্য হাতটা বাড়াতে গিয়ে ওই চোখের সামনে পড়ে জাঁদরেল ছোটবাবুর হাতটা থেমে ওর পাশে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ সময় মাত্র, এরপরে উনি দ্বিগুণ উৎসাহে ভাইঝির চুলের মুঠি ধরেন, 'অ্যাঁ, আবার চোখ রাঙানো?

বল তোরা কী খাস ?'

হতভম্ব সুসী বঝুতে পারে না তার কী অপরাধ ? অবাক হয়ে উত্তর দেয়, 'কেন ? রান্নার মাসি তো তোমাদের খাইয়ে দাইয়ে যা থাকে আমাদের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখে !'

'অ্যাঁ ! বললেই হল ওই সব খেয়ে এত সুন্দর চেহারা হয়' ! মাঝখান থেকে কাকিমণি বলে ওঠে ! কাকু ইতিমধ্যে একটা তিন-কোনা শিরা-ওয়ালা পেনসিল সুসীর মাঝের দুটো আঙুলের ফাঁকে রেখে গায়ের জোরে চাপতে থাকে—'বল ! বল ! আজ ফ্রিজ খুলে পুডিং আর দই কে খেয়েছে ?' যন্ত্রণায় বাচ্চাটার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে কিন্তু একটুও চিৎকার করে না। টানা চোখ দু'টোকে গোল গোল করে শুধু তাকিয়ে থাকে আর দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করে। একবার শুধু বলে···'কাকু ছেড়ে দাও বলছি ! ভাল হচ্ছে না !'

'কী আমাকে হুমকি দিচ্ছিস ! তবে রে মেয়ে' · কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ হাতে সুসীর গালে একটা চড় কষায়। ফর্সা চামড়ার ওপর তিনটে গ্রহশান্তি আঙটির নীচের দিককার ছাপ পড়ে সুসীর গালে। তিনটে বাঁকা চাঁদ হয়ে ফুটে ওঠে। দু-নম্বর চড়টা তুলে বসাবার আগেই রান্নার মাসি কোন একটা কাজে ঘরে এসেছিল ; বলে উঠলো—'ছোট কর্তা—ইঁটি ভাল করতিছিন না ! আমি নিজে স্বচক্ষুতে দেখেছি দোলা পুডিং টা খেয়িছে···' সে দিকে একবার তাকিয়ে ছোটকর্তা তাকে ধমক দিল—'তুই চুপ কর মাগী ! যতবড় মুখ নয়···কালকেই চলে যাবি···' রান্নার মাসি, মাথা নীচু করে চলে যাবার সময়ে একবার সুসীর দিকে তাকাল। সুন্দর গালে তিনটে ধাতব—পাত কেটে বসে গেছে। লাল রক্ত জমে কালো দাগ হয়েছে কয়েকটা জায়গায়। তার বুক চিরে বেরিয়ে এল— 'ভগবান ! একী অত্যাচার !' রান্নার মাসি তাকিয়ে থাকে সুসীর দিকে। সুসীও দেখে রান্নার মাসিকে····বিড়ালটা আবার একটা থাবা বাড়ায় পায়রা বাচ্চাগুলোকে ধরার জন্য, বাচ্চাটাকে পায় না, মা-টার মাথায় বসায় থাবা, ঝটপট করতে করতে মা পালায়····

'বল ! কে খেয়েছে পুডিং···· ?' পেন্সিলটা কেটে কেটে

আঙুলে বসতে থাকে····

'শুনলে তো কে খেয়েছে? ছাড়ো বলছি····' পুঁচকে মেয়েটার গলায় নির্দেশের সুর! 'তবে রে!····' বলে যেই কাকু ওর চুলের মুঠিটা ধরতে যায়—এক ধাক্কা মারে কাকুকে। কাকু ছিটকে পড়ে মেঝেতে খাটের পায়াটার একটা ধার এসে তার পিঠে লাগে····সে দিকে তাকিয়ে সুসী নিজের সদ্য-শেখা গালাগালিগুলো উগরে দেয় ····'শুয়োরের বাচ্চা! লোচ্চা! চোর···অন্যকে আবার চোর বলা' ···পড়ে আঘাত পাওয়া লোকটা চোখে সর্ষেফুল দেখার পরিবর্তে দেখে একটা ছিন্নমস্তা নারীমূর্তি খড়্গ হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে···টলতে টলতে উঠে তিনি বিছানায় বসে পড়েন মাথা তুলে দেখেন ডিভানের কালিমূর্তিটার আলো জ্বলছে···সুসী ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে নিচে।

বিড়ালের থাবার ঘা খেয়ে মাকে পালিয়ে যেতে দেখে জোর করে বড় হয়ে যায় পায়রা বাচ্চাগুলো। হঠাৎ উড়তে শিখে যায়। বিড়ালটার গোঁফে হাওয়া লাগিয়ে চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যায়। নামার সময় সুসী দেখে বাচ্চাগুলোর উড়ে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে বিড়ালটা থাবা দিয়ে লালা মুছছে···'এই শুয়োরের বাচ্চা ভাগ!···' তাড়া খেয়ে বিড়ালটা লাফ দেয় নীচের দিকে।

আস্তে আস্তে একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে সে নিচে নামে···

৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫···।

॥ তিন ॥

পনের বছরের সুসী দিনে দিনে রূপবতী হয়ে উঠেছে। ঘরে কোথাও তার স্বীকৃতি নেই, জীবনের রঙ কেমন? যে দেখে যেমন। সত্যিই কি ইচ্ছামত দেখার উপায় আছে? মাঝে মাঝে একা ছাদের ওপর পায়চারি করতে করতে ভাবতে থাকে ফুটফুটে মেয়েটা। অনেক অত্যাচার সহ্য করেও ওরা সহ্য করে নিয়েছিল কাকু, কাকিমণি, দাদা-ভাই, দোলাদের। শুধু পরীক্ষাটা দেবে বলে। সেই কাকুরা ওর উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগেই পৃথক হয়ে গেল। ১৫ বছরের মেয়ের সামনে ভবিষ্যৎ গড়ার

প্রথম সোপান হল কন্টাকীর্ণ। সামনে কাঁটা, বিছে আর বিষাক্ত সাপে ভরা পথ, ঘাড়ে বর্তমান। বৃদ্ধ উদাসীন বাবা, ছোট ভাই বোনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব। কাজের লোক, রান্নার লোক, সব নিয়ে কাকুরা চলে গেছে আর একটা পৈত্রিক বাড়িতে। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি কালচারের সঙ্গে তাঁরা ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। ওঁদের স্ট্যাটাসে বাধে। কাকুদের ঘরের দিকে তাকায়....। ফাঁকা ঘর তালাবন্ধ। বিশাল পাঁচতলা বাড়ি ফাঁকা, চোয়াল শক্ত হতে থাকে। মনে পড়ে যায় একটার পর একটা ঘটনা। যাবার দিনে কাকিমণির মন্তব্য, 'এখানে থাকলে দোলার বিয়ে হবে না। একেই ও দেখতে অত সুন্দরী, তারপরে পরীক্ষাতে তো নির্ঘাৎ এ বছরে দশের মধ্যে থাকবে...' স্কুল, পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেকেই তাকিয়ে আছে ডাক্তারবাবুর মেয়ের দিকে। বিনা মেঘে কি? না, একটা সবুজ-চোখো দৈত্য সব হিসাব ভণ্ডুল করে দিল।

কাকুদের পৃথক হবার কথা শুনে হিসেবের খাতা থেকে বিস্ময়ে চোখ তুলেছিলেন বাবা!—'সে কী কেন?' বাবার সব হিসাব সেই দিন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কাকুদের হাতে পায়ে ধরে বারবার বললেন, 'সুসীর পরীক্ষাটা হয়ে যাক্!' গ্রাম্য-কুটিলতার সরল কথাটা কাকিমণি বলে ফেলে, 'ওর জন্যই তো যাচ্ছি।' শহুরে ডাক্তার বউমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলতে পারলেন, —'বউমা! ঐটুকু বাচ্চা! সেও তোমার ঈর্ষার বস্তু!' তারপর সুস্মিতাকে হাত ধরে টেনে এনে বলেছিলেন, 'কাকিমণির কাছে ক্ষমা চেয়ে থাকতে বলো!' ঘাড় বাঁকিয়ে তার জবাব, 'না'। ভেঙে পড়লেন বাবা, 'কে দেখবে এসব? তোর পরীক্ষার মাত্র একমাস বাকি, কে সব করবে?'

'আমি?' বাবাকে আশ্বস্ত করল সে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঢি ঢি পড়ে গেল, 'একটা পুঁচকে মেয়ে সংসারটা ভেঙে দিল!' পাড়ার লোকেও তাই বিশ্বাস করতে শুরু করে। কাকে বোঝাবে? কত চিৎকার করে বলবে সে দায়ী নয়। বাবাও বিশ্বাস করতে শুরু করেন সেই চিৎকার। ভেঙে যায় তাঁর সব প্রতিরোধ। প্রচারে বাবা বিরূপ, ঘাড়ে চাপলো বর্তমান। ছোট নরম ঘাড়।

চোখে ভবিষ্যৎ···না, তার রঙটা আর সুস্মিতার কাছে উজ্জ্বল নয়, সবুজ নয়, বাসন্তি নয়, নিছক ধূসর।

পরীক্ষা সামনে···ভবিষ্যতের রাস্তা···বই পত্র উঠে গেল আলমারিতে। নোট, হোম-ওয়ার্ক, কেউ খাটের তলায় কেউ পুরনো কাগজের বাক্সে আত্মগোপন করে। একমাত্র ভরসা মাথা, মাথাটা ভাবে পরীক্ষার কথা, হাতটা উনুন ধরাতে নোংরা হয়, মাছ কাটতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত। জামা-কাপড় কাচতে গিয়ে অবশ হয়ে যায়···এত করার পরেও কেউ বলে না, 'আহা রে!'

'সত্যিই কি আমি এত খারাপ? সকলে যে-রকম বলে বেড়াচ্ছে ···ততটাই খারাপ আমি?' নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর পেতে চেষ্টা করে কিশোরী, যুক্তিতে মিলছে না, 'তা হলে সকলে বলে বেড়াচ্ছে কেন?' উত্তরটা ধোঁয়াশা, কাকুর সামাজিক স্বীকৃতি আছে। কাকু লোকের সর্বনাশ করতে পারে। সর্বনাশ করার জন্য একদল লোক পুষতে পারে···

নিচে ভাই-এর পড়ার আওয়াজ " 'অথঃ পণ্ডিতঃ সারমেয় কথা···

'একদা এক পণ্ডিত ভোগের নিমিত্তে একটা কচি পাঁঠা ক্রয় করিয়া··· বাড়ি অভিমুখে চলিতে লাগিল··· পথিমধ্যে চারজন ঠগীদের ইচ্ছা হইল ঐ পাঁঠাটা তাহারা খাইবে···

তাহারা চারিজন কিঞ্চিত দূরত্ব ব্যবধানে পণ্ডিতের পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পণ্ডিত প্রথম ঠগীর নিকটবর্তী হইলে সে বলিল—'নমস্কার পণ্ডিত!' বলিয়াই সে চমকিত হইবার ভান করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—'ছিঃ ছিঃ ঠাকুর, সাত সকালে কাঁধে করিয়া কুকুর লইয়া চলিতেছেন? ছিঃ ছিঃ।' পণ্ডিত বিরক্ত হইয়া ঠগীকে ধমকাইলেন—'তুমি কেমন আহম্মক যে পাঁঠাকে কুকুর বলিতেছ?' ঠগী হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'ঠাকুর আপনার বয়োবৃদ্ধি জনিত পীড়াতে মস্তিষ্ক বিভ্রাট এবং চক্ষু বিভ্রম ঘটিয়াছে···।' পণ্ডিত আপন মনে ঠগীকে তিরস্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইল···কিঞ্চিত দূরে দণ্ডায়মান দ্বিতীয় ঠগীও ঠাকুরকে একই কথা বলিল। পণ্ডিত কাঁধ হইতে পাঁঠাটাকে নামাইয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, 'মূর্খ দেখিতেছ না,

ইহা ছাগ শিশু! কুকুর হইবে কেন?' দ্বিতীয় ঠগী হাসিয়া বলিল, 'ঠাকুর আপনার বিভ্রম হইতেছে?' এইবার ঠাকুরকে কিঞ্চিত চিন্তিত লাগিল…তবুও তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়াইলেন… কিছুদূর অগ্রসর হওয়া মাত্রই তৃতীয় জন ঠাকুরের পথ অবরোধ করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, 'ওহে, গ্রামবাসীগণ দেখিয়া যাও! তোমাদের পুরোহিত মহাশয় সকাল বেলা কুকুর কাঁধে করিয়া চলিয়াছেন…।' পণ্ডিত কাঁধ হইতে ছাগ শিশুটিকে নামাইয়া, নিজের চোখ বারবার কচলাইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন… কোথাও তিনি সারমেয়র কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না…কিন্তু বিভ্রাটে পড়িলেন….সন্দেহ তাহাকে গ্রাস করিল। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গৃহাভিমুখে পা বাড়াইলেন…এবং চতুর্থ ঠগের সম্মুখীন হইলেন, 'ঠাকুর! ফেলে দিন, ঐ সারমেয়! গ্রামবাসীগণ দেখিতে পাইলে আপনাকে সমাজচ্যুত করিবেন।' ভীত সন্ত্রস্ত পণ্ডিত কাঁধ হইতে ছাগশিশুকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া….ছুটিতে শুরু করিল….চারজন ঠগ….মহাস্ফূর্তিতে সেটিকে লইয়া চলিল ভোজ করিতে….' "।

ভাই-এর পড়ার তদারকি করবার জন্য ওপর থেকে নীচে এসে সুস্মিতা দেখে বাবা কখন এসে গেছেন, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই সে বাবার কথা শুনতে থাকে….'বুঝলি, এটাই হচ্ছে চাণক্য নীতি।….চাণক্য এই রকম অজস্র পুরনো গল্প দিয়ে রাজাকে অন্যদেশের রাজার বিরুদ্ধে কী করে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে হয় সেটা বোঝাতেন….কী করে ব্যবসা বাণিজ্য করতে হয় সেটা বোঝাতেন। মোদ্দা কথায়….শব্দই ব্রহ্ম! সেই কথা দিয়ে বার বার একটা জনমণ্ডলীর মধ্যে….বিভ্রান্তি তৈরী করো….সে তখন দুর্বল হয়ে পড়ে….তার নিজস্ব ভাল জিনিসটাকেও বিসর্জন দিয়ে বসে….সুস্মিতা দরজার ভেতরে পা বাড়ায় না। আবার ওপরে উঠে যায়…রাত গভীর হতে থাকে, সুন্দর গোধূলি গ্রাস করে অন্ধকার। ….আলো-আঁধারিতে পার্কের গাছগুলোর ছায়া নির্জন ছাদটাতে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরী করে….তার বয়স বাড়তে থাকে….

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্দী আত্মা মুক্ত দেহ

পুরানো ডায়েরী থেকে—'৮৯ সাল

২৫শে ডিসেম্বর—সকাল থেকেই একটা ডিপ্রেসন গ্রাস করেছে। মিরাট থেকে দলে দলে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক চলে আসছে কলকাতায়, ইঁটপুজো ইতিমধ্যেই সেখানে ৫0 জনের জীবন নিয়েছে, আতঙ্কিত এই লোকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন সংগঠন নেই··· আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতাতেও। আমার ওয়ার্ড-বয় কাশিম ছুটির দরখাস্ত দিয়েছে, ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না এখানে কোন ভয় নেই···। বোঝাবই বা কী করে? ন' বছরের বাবাই, আট বছরের তিন্নী, যারা পুজো, ভাই-ফোঁটা করেই বেড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যেই যদি এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়, 'বাবা, তুমি বেরুলেই এদেশ থেকে আমরা চলে যাব'! জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন রে!' ওদের চোখে-মুখে এক আতঙ্কের ছায়া, 'আমরা যে মুসলমান!'

ধমক দিয়ে উঠলাম, 'কে বলেছে?' 'ট্রেনে এক দিদি?' চুপ করে গেলাম, ওপার বাঙলা থেকে লোক ডেকে আনা হচ্ছে, এপারে আতঙ্কিত মানুষ বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে ভীড় করছে, দুই দল নিরাপত্তাহীন জীব মুখোমুখি, কারুরই কিছু নেই, শত্রু অদৃশ্য, এদের আছে শুধু হাত আর নখ। দু-দলই আতঙ্কিত। প্রচার ছড়িয়ে পড়ছে সর্বগ্রাসী আগুনের শিখার মত···।

এরই মধ্যে অধ্যাপক বন্ধু এসে আবার এক রাউণ্ড বোম্বার্ডমেন্ট করে গেলেন—মস্তিষ্কে। 'তোমাকে ভাবতেই হবে আজিজুল, এই ঝড়ে উটপাখির মত বালিতে মুখ ঢেকে কত দিন বাঁচবে?'

'ধ্বংস হয়ে যাব!' কাটা উত্তর দিলাম—'তবুও তোমাদের মত অরক্ষিত গৃহস্থের বাড়ি ঢুকে সোনাকে পিতল বলে কিনে নিয়ে ব্যবসা করতে পারবো না।···'

—'কিন্তু সত্যটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না?'

—'কোন্‌টা সত্য ?'

—'এই ধরো সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে…'

—'না, এটা সত্য নয়। চরম মিথ্যা, সূর্য ওঠেও না, ডোবেও না। পৃথিবীটাই ঘোরে…'

'মানলাম, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো এত তত্ত্ব কথা বুঝবে না।…'

'সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে আর যাই হোক সত্য বলে চালিও না · সেটা বড় তরল !'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'সমাজতন্ত্রের সার্বিক ব্যর্থতাকে তুমি অস্বীকার করবে কী করে ?'

'যেমন ভাবে যে যুক্তিতে তুমি অস্বীকার করছো তার সাফল্য-গুলোকে ! যে যুক্তিতে তুমি মনে করছো রুটি, ভাতের সমস্যার ওপরে যৌন-তৃপ্তি আর ভোগ, যে যুক্তিতে তুমি 'ইদ'-এর (পশু মনের) যুক্তিকে স্বাভাবিক বলে মনে করছো ?'

'স্তালিনের ঐ চরম নিষ্ঠুরতা তুমি সমর্থন করো ?'

'কোথায় পেলে ?'

'কেন খ্রুশ্চভ বলেছিল, এখন গর্বাচভ বলছেন ?'

'পেন্টাগন পেপারস পড়েছ ? কে এই খ্রুশ্চভ ? ক্যাম্প-ডেভিড করে যে সমাজতন্ত্রকে বন্ধক রেখেছে ! আজ তো পেন্টা-গনের কর্তারা খ্রুশ্চভকে নিয়ে হাসাহাসি করছে…'

'কিন্তু লেনিন বলেছেন…?'

'কোথায়, কত সালে ?'

'তাঁর সেক্রেটারির ফাইলে একটা নোটে, ১৯২২ সালে…'

'কী বলেছেন ?'

'স্তালিন বড় নিষ্ঠুর !'

'ওঃ এই কথা ! তারপরে দু'বছর বেঁচে থেকেও লোকটা এই দানবকে সরাতে চেষ্টা করলেন না। তাঁর আস্তিনে একটার পর একটা প্রশংসার পালক গুঁজে দিয়ে গেলেন ?

'বলে গেলেন পার্টিতে এই যে উপদলীয় চক্রান্তে এক উঠোন বারো হাঁড়ি এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র স্তালিনের মত গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন একজন লোক !'

—'ওসব তো স্তালিন আমলের কথা '

'না, হে না, তোমাদের গর্ভস্রাব থুড়ি গর্বাচভের আমলে প্রকাশিত লেনিন ভল্যুমেই আছে। তা লেনিন যে লিখিত ভাবে তাঁর লেখাতে অন্তত আঠারবার ট্রটস্কিকে রাশিয়ান বিপ্লবের জুডাস মানে মিরজাফর বলে গেছেন সেটা তো একবারও বলছো না…'

একটু চুপ করে থেকে অধ্যাপক শুরু করে, 'এ সপ্তাহের সি-এন-এন প্রচারিত ওয়ার্ল্ড দিস উইক কী দেখাচ্ছে জানো? ওরে ব্বাস! মধ্যযুগের বাদশাও তো এরকম বাড়িতে থাকতো না। সোনার চেন দেওয়া, হীরে লাগানো জুতো!…সাবাস! কমিউনিস্ট নেতাদের বাড়ির রেলিং সোনার পাত দিয়ে মোড়া…' হো হো করে হেসে ফেললাম, 'দ্যাখো আমি সেসেস্কুপন্থী নই, তাঁর ঐ 'সোনালী মধ্যপন্থার' রাজনীতির তিনি বলি হলেন, শীতে আধমরা সাপকে বুকের তাপে বাঁচিয়ে তুলতে গিয়েছিলেন, ইঁদুর-গুলোকে বর দিয়ে বাঘ করেছিলেন—তারাই আজ তাঁকে খেতে উদ্যত, তবুও বলছি…এটা বলছে সি-এন-এন্, আচ্ছা বাড়িটা দেখে একবারও তোমাদের মনে হল না এই বাড়ির সমগ্র স্থাপত্যটা সপ্তদশ শতাব্দীর। এটা রুমানিয়ার সম্রাটের বাড়ি ছিল। ওখানকার জিনিসগুলো মিউজিয়ামের বস্তু!… তোমাদের কত সহজেই বোকা বানানো যায়। আসলে তোমরা নিজেদের বস্তুকাম, নিষ্ঠাহীনতার যুক্তি খোঁজার জন্য পাগলের মত হাঁতড়ে বেড়াচ্ছ। তোমাদের পশুমন (ইদ) তোমাদের তাড়না দিচ্ছে, দৌড়ুচ্ছো… আবার "ইগো" বাধা দিচ্ছে…হায়, ড. ফাউস্টাস!…অহেতুক এসব প্রচার চালাচ্ছো কেন? নিজে পারোনি সেটা বুঝি। এসব করছো কেন বলো তো?…'

আমার তিরস্কার সমাজ-স্বীকৃত অধ্যাপক হজম করবেন কেন? বলে উঠলেন, 'তুমি বড় ইররেশানল!'

'শিশু মনের সরল যুক্তি যদি বারবার বড়রা শক্তির জোরে অগ্রাহ্য করেন নিজেদের লালসা ঢাকার জন্য, সেই শিশু যখন বড় হয়—তখন তার মনে হয় সে যা করছে সব-ই ঠিক, কারণ সে যখন ঠিক কর়তো তখনও বড়রা তাকে ভুল বলতো।… সে ইররেশনাল

হবেই, সে কারুর কথাই শুনতে চাইবে না। সে সব সময়ই চাইবে স্পেশাল-অ্যাটেনশন!…প্রভাত গিন্নীকে দ্যাখোনি… ?'

'বীভৎস, মহিলা সামান্যতম সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, পাগল না কি বলো তো? প্রভাতের জীবনটা হেল হয়ে গেল!…'

'কিন্তু দাদা কে করলো? এই রকম এক সি-এন-এনের প্রচারে তোমরা শর্তাধীন হলে, একটা ফুটফুটে কিশোরিকে তার কথা বলতে দিলে না। বেড়ে ওঠার মুখেই তাকে ধ্বংস করলে…সে খুঁজে বেড়াতে শুরু করলো সত্যি কথা বলার জায়গা…

॥ দুই ॥

সুস্মিতা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলো প্রথম বিভাগে. ইংরেজিতে লেটার নিয়ে। তবে প্রথম দশজনে থাকলো না। ভর্তি হল একটা কলেজে…। কো-এডুকেশন কলেজ। একদঙ্গল ছেলে জুটে গেল তার চারপাশে, জীবনে প্রথম এই একটা জায়গা পেল—যেখানে সে এলো, দেখলো, আর জয় করলো।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কোন রকমে বাবা, ভাই-বোনের জন্য রান্নাটা সেরেই সে বেরিয়ে পড়ে…। আবৃত্তি করে, গান গায়, সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যায় এমন সব জায়গাতেই যেতে শুরু করে। সে যা করে বন্ধুরা প্রশংসা করে। উঠতি তরুণের দল প্রত্যেকেই ওর ঘনিষ্ঠ হতে চায়। আড্ডা জমে কফি হাউসে, জুটে যায় আরও বন্ধু। দুনিয়াটা ওর কাছে তত খারাপ মনে হয় না। বন্ধুমহলে সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সুস্মিতা। গর্বে বুক ফুলে ওঠে। একদল ছেলেকে ও শাসন করে ·। একটা আতঙ্ক ওকে চেপে ধরে…এরাও কি আমাদের বাড়ির প্রচার শুনেছে? যদি শুনে ফেলে কী হবে?' এই-জগৎটা হারানোর ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। আরও বেশী করে সময় দিতে থাকে বন্ধুদের…। বাড়ির কাজ ক্রমশ পিছনে পড়ে যায়…

এদিকে ভাই বড় হয়েছে। তার দাবী বাড়ছে বাড়ির কাছ থেকে। সে দাবি জানাতে থাকে সময়ে খাবার, সময়ে পড়ার। অত্যাচার আবার নতুন মাত্রা নেয়…বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ ওকে পেতে চায় ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গিনী রূপে। তারা প্রশংসা করে ওর শরীরের।

'এই গলা ! এতে তো মানায় এক-ছড়া মুক্তোর মালা !' কেউ বা ওর আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করে বলে,—'এই হাত কি মাছ কোটার ? রান্না করার ? শিল্পীর বর পাওয়া হাত ?' তুমুল তর্ক শুরু হয় তাদের মধ্যে, মরলিন মোনরো, না গ্রেটা গার্বো···কার সাথে সুস্মিতার সাদৃশ বেশী। চুলটা তো জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের ! খিলখিল করে হেসে ওঠে সে, 'চোখটাতে কিন্তু কোন ইঙ্গিত নেই। পাখির নীড়···বাপসে রে ! তার পর ঠেকাও বেড়ালের হামলা, সাপের হামলা !' মনে পড়ে যায় একটা দিনের কথা, কেমন সব বিস্বাদ লাগে। ভাই-এর জন্য প্রাণটা কেঁদে ওঠে। নিঃসঙ্গ বাবা গ্রাস করে। বাবা হয়তো এখনও হিসাব কষছেন···

'কিছু খাওয়া যাক !' কে একজন প্রস্তাব করে, 'তোমরা খাও ! আমি খাবো না !'—সুস্মিতা বলে।

'কেন ?'

'না রে ! ভাইকে ফেলে আমি কোথাও কিছু খাই না···'

'ঠিক আছে তোর ভাইও আমাদের অনুপস্থিত সদস্য····ওর জন্য নিয়ে যাবি···' প্রন কাটলেট, পকৌড়া নিয়ে ওরা শুরু করে। কখনও কবিতা, কখনও বাংলাদেশ যুদ্ধ, কখনও নক্শালদের বীরত্বের কথা। শিহরন জাগে সুস্মিতার। ছেলেদের একটু স্বীকৃতি, একটু ছোঁয়া, একটু দরদ ওকে প্রগলভ করে দেয়। কিন্তু ছেলেগুলো এতসব জটিল বিষয়ে কথা বলে···

ও শুরু করে দেয় নিজের বংশের আভিজাত্যের কথা। রবীন্দ্রনাথ, শিশির ভাদুড়ী প্রত্যেকের সঙ্গে ওদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কথা। বলতে বলতেই ভালবেসে ফেলে সেই বাড়িটাকে যেটা ধ্বংস করেছে ওর শৈশব, ওর ক্যারিয়র···যত বেশী করে বলে ততই বাড়িটা ওকে গ্রাস করে···তিনপুরুষ আগের অতীত সদ্য আঘাতের ঘায়ের দাগগুলোতে প্রলেপ বোলাতে থাকে···। একটা মিথ্যা মোহ তৈরি হয়···। যেমনটা হলে ভাল হতো, ওর মনমতো হতো—সেটাকে বাস্তব করে নেয়···কিন্তু···।

এইসব তরুণরা সত্তরের সর্বস্বত্যাগী তরুণ নয়। এদের স্বভাবে সেই ত্যাগ নেই। করুণা আছে, সমবেদনা নেই। সত্তরের বীরত্বকে এরা শ্রদ্ধা করে···কিন্তু ভালোবাসে কেবল নিজেদের।

জীবনটাকে ঝুঁকিবিহীন উপভোগের মন্ত্রে এরা দীক্ষিত। সুসীর কাছে 'কাকু'দের অত্যাচারের কথা শুনে এরা করুণা করতে শুরু করে তাকে। সুসী ভাবে এটাই বুঝি ভালোবাসা…'জানিস একই খাবার টেবিলে বসে দুটো বাচ্চাকে তাদের মা ঠেসে ঠেসে মাংস খাওয়াচ্ছে। পৃথক করে দই, সন্দেশ দিচ্ছে।…আর আমার ছোট ভাইটা হয়তো বলে উঠল—'কাকিমণি একটা মানসো দেবে?' অমনি মুখ-ঝামটা…' তারুণ্য আর শিভালরিতে ছেলেগুলো জ্বলে ওঠে…'চল শালা, একদিন তোর জানোয়ার কাকুটাকে কেলিয়ে দিয়ে আসি…' শিউরে ওঠে সুসী ··'না, না, ওসব করতে যাস না, সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় ওরা যা খাবে তার একটা করে প্যাকেট সুসীর বাড়ির জন্য দিতে হবে। ওরা সিনেমা দেখলে ভাই-এর জন্য টিকিটের দাম দিয়ে দেবে ··। সুসী ভাবে এমন মানুষও দুনিয়াতে হয়!

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘোরে…ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের শেষের আগের ধাপ পার হবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হতে থাকে। পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে সকলেই সরে পড়তে থাকে। এরা ৬৫-৭০-এর ছেলে নয়। ৭০-৭৩-এর ছেলে। হিসেবি, হিসেব করে অগ্রসর হয় জীবনটাকে চেখে দেখার জন্য, এরা উদ্দাম। শুধু একজন-ই সম্পর্ক রাখে সুসীর সঙ্গে। নিজের পরীক্ষারখাতা খুলতে গিয়ে সুসী দেখে…সব ফাঁকা…পরীক্ষা দেবার মত কোন নোটের পুঁজি নেই ওর…। ভাবে, 'না, এখনও সময় আছে…এবার একটু হোমওয়ার্ক করা দরকার…ঘরে বসা দরকার…। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সব সিদ্ধান্ত পাল্টে যায়। দরজা খুলে দেখে চানটান করে দীপক এসে হাজির হয়েছে।

'সে কীরে তুই?'

'পড়তে পড়তে পাগল হবার উপক্রম! চল একটা সিনেমা দেখে কোথাও চাইনিজ খেয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।'

'কিন্তু আমি তো এখনও শুরুই করিনি…'

'করিসনি যখন করতে হবে না, চল…চল…'

আমুদে সুসী কর্তব্যসচেতন সুসীকে ঠেলে দিল তৈরী হতে। কেউ বাধা দেবার নেই…

সন্ধ্যার চৌরঙ্গি ধরে ওরা হাঁটতে থাকে, ওরা ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি চলে....'আঃ মুক্তি!' সুসী দীপকের খুব কাছে চলে আসে....চৌরঙ্গির আলো ওদের ঠেলে দেয় অন্ধকারে.... ?

॥ তিন ॥

স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মেসমারের বিশাল প্রতিপত্তি। তিনি হিস্টিরিয়া ভাল করছেন, অবসাদগ্রস্ত দ্বিতীয়-জীবনপ্রাপ্ত মহিলাদের অবসাদ দূর করছেন....বৃদ্ধ অক্ষম অভিজাতদের তরুণী স্ত্রীকে সন্তানের মা করে দিচ্ছেন, রক্ষা হচ্ছে সম্পত্তি, চারদিকে হৈ-হৈ ব্যাপার!

দিনের আলো শেষ হতে না হতে ডাঃ মেসমারের সুন্দর হাসপাতালের সামনে মহিলাদের দেখা যায়। তিনি সাত থেকে দশজন রুগী দেখেন প্রত্যেক দিন। অভিজাতরা ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে স্বপ্নের বাড়ি ওটা, আতঙ্কেরও! কী স্বপ্নের রঙ সমগ্র বাড়িটাতে ছড়িয়ে আছে! রুটি নেই? কেক নেই? মানুষ ভাবে—'সব আছে ঐ বাড়িতে!' অভিজাতরা ভাবে কী করে খরচ করবে এত টাকা! মানুষগুলো ক্ষেপে যাচ্ছে....ওদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। খবর আসছে....তালুক-মুলুক লুঠ করে নিচ্ছে ওরা। উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হচ্ছে, দুঃশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না রাজা-রানী, পাত্র-মিত্র-অমাত্যদের। একটা বীভৎস অনিদ্রা-রোগ গ্রাস করেছে সমাজকে। দেশে খবর রটে গেল, 'জোঁক পাঠাও....জোঁক; শেরি, শ্যাম্পেন, বা কড়া মদেও রক্তের চাপ ঠাণ্ডা হচ্ছে না, উত্তেজনা নিষ্কাষনের ব্যবস্থা চাই!'

ডাক্তাররা বিধান দিলেন, 'ক্ষয়িত যৌবন, এবং বিগত যৌবনরা, যদি সক্ষম ব্যক্তিদের মিথুন দৃশ্য অবলোকন করেন, তাহলে তাঁরা উত্তেজিত হতে পারবেন, তখন-ই একমাত্র অবসন্ন হয়ে পড়ে নিদ্রামগ্ন হবেন।'

প্যারিসের অভিজাত পল্লীতে গড়ে উঠল 'গ্লাস-হউস'। জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণীকে ভাড়া করে এনে সেখানে যৌন ক্রিয়ায় নিযুক্ত করা হতে থাকে। ব্যালকনিতে বসে অভিজাতরা দেখেন সেই দৃশ্য উত্তেজিত হবার জন্য, উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ..

আর শহর কলকাতায়? ঔপনিবেশিক কলকাতায়? এঁদের কাউন্টার পার্টরা এত সৃজনশীল হতে পারেন না। বাইজী নাচান, পায়রা ওড়ান…নিজেরাই চেষ্টা করেন…এঁরাই হলেন বাবু। এঁদের সংস্কৃতিই হল বাবু-কালচর। নোবলদের, বাবুদের অন্দর-মহলের মেয়েরা 'লিবিডো' রক্ষা করেন কী করে? যৌবন তো রক্ষা করা যায় কোন রকমে। কারণ যৌবনের অনেক রঙ। তার পথ সে দেখে নেয়…

নানান সৃজনশীল বা ধ্বংসাত্মক কাজে অলস লোকেরও যৌবন 'অলস' থাকে না। কিন্তু যৌবনের শুরু এবং শেষের সন্ধি-ক্ষণের জ্বালা যে বড়…। কী করবেন তাঁরা। নাগর পোষেন, মা-পিসি-মাসি কাকীদের নাগর-জীবনযাত্রা দেখতে দেখতেই বড় হয়ে ওঠে নাগরিক অভিজাত কিশোরী। জ্ঞান হবার পর থেকেই রক্তে তার বিষের জ্বালা। পেটের চিন্তা নেই, এরা ভাবে শুধু জ্বালার কথা। এই জ্বালার গল্প, জ্বালার গান, জ্বালার সংস্কৃতিই ইনিয়ে বিনিয়ে হাজির হয় অভিজাত পল্লীতে…বাবুদের বাড়িতে বাড়িতে!…

ডাঃ মেসমারের হাসপাতালে লাইন। ফরাসি দেশের সব থেকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান দশ-পনের জন যুবক রোগিণীদের অ্যাটেণ্ড করেন। সুবেশ এই তরুণরা রোগিণীদের নাম-ঠিকানা, রোগের ইতিহাস নিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে দেন। বাকিরা হতাশ হয়ে ফিরে যান, অবসাদগ্রস্ত, ঘ্যানঘ্যানে মেনাপোজ-গ্রস্ত মহিলা এবং যৌবনাক্রান্ত কিশোরী…অবসন্ন, অনিদ্রা, হিস্টিরিয়া…কিছু ভাল লাগে না যাদের তারা, কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না।

এক একজন তরুণ এক একটা রোগিণীকে নিয়ে এক-একটা কেবিনে ঢুকে যান। কেবিনগুলো একটা বড় হলের দু-পাশে সাজানো। হলের মধ্যে ঢুকলেই মিষ্টি সুরের বাজনা। আবছা আলো…মাঝে-মধ্যে রঙ পাল্টাচ্ছে সুরের তালে তালে। কেবিনের ভেতরে একটা উঁচু ইজিচেয়ারে সেখানে রোগিণী অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকতে পারেন। একটু নীচুতে একটা বড় টুলের মত জায়গা। অ্যাটেণ্ডেন্ট্ হল থেকে রোগিণীকে পাঁজা-কোলা করে তুলে আনেন। অ্যাটেণ্ডেন্টের প্রশস্ত উন্মুক্ত লোমশ বুকের

সঙ্গে রোগিণীর নরম বুকের স্পর্শ ঘটে। পতনের ভয়ে রোগিণীর হাত দুটো অজান্তেই তার গলাটা আঁকড়ে ধরে। তাই সুগঠিত নগ্ন বাইসেপের মধ্যে মুখটা চেপে যায়। বাইসেপে ঠোঁটের চাপ। চুলের বাঁধুনি আলগা হয়ে খুলে যায়। অ্যাটেণ্ডেন্টের বাহু থেকে সেগুলো ঝুলে পড়ে। লজ্জায়, আশংকায়, শিহরনে রোগিণীর চোখ আধবোঁজা। অ্যাটেণ্ডেন্ট তাকে বয়ে আনে কেবিনে। আধা-শোয়ানো অবস্থায় বসিয়ে দেয় তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে।

এক অদ্ভুত আরামে রোগিণী চোখ বন্ধ করে....আধা বোজা.... আধেক আঁখি পাতে সে দেখে কোথায় সে....। সুন্দর এক তরুণ তার টপগুলো খুলে ফেলছে। কেবিনের মধ্যে আলো রঙ পাল্টাচ্ছে। তরুণ টুলটায় এসে বসে রোগিণীর জঙ্ঘা থেকে নগ্ন পা তুলে নেয় নিজের কোলে। রেকর্ডে এক মায়া-ঝরানো সুর....। পরম নিশ্চিন্ততায় রোগিণীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটা শব্দ! বলা যায় একাধিক অক্ষর। 'শব্দ' হবার যোগ্যতা তাদের নেই.... তবুও সেগুলো একটা অর্থ বোঝায়....'আমি সুখী!' এক হাতে রোগিণীর জঙ্ঘা থেকে পদমূলে পেশাদারী আঙুল চালাতে চালাতে অ্যাটেন্ডেন্ট রোগিণীর হাতে তুলে দেয় একট পানীয়। ডাঃ মেসমার'স প্রিপারেসন! দুর্লভ বস্তু। চুমুক দেয় রোগিণী। অ্যাটেন্ডেন্টের অঙ্গুলি সঞ্চালন নানান তাল এবং লয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রোগিণী এক বিশেষ জগতে চলে যায়....যেখানে দুশ্চিন্তা নেই....দিন নেই, রাত নেই....আছে শুধু রক্তের জ্বালা মেটাবার পানীয়....পদ সেবার জন্য সুন্দর অর্ধ নগ্ন তরুণ....। অ্যাটেন্ডেন্ট্ এই অবস্থায় রোগিণীকে আবার পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে যায় দোতলায়। সেখানে স্বয়ং ডাঃ মেসমার এবং তাঁর দশজন বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক রোগিণীদের দেখেন।....

রোগিণীরা পরম পরিতৃপ্তিতে ঘুমান....। প্রকৃতিতে আলো ফোটার আগেই, নাইট ক্লাবের সদস্যদের ঘরমুখো হবার বেলায় তাদের জাগিয়ে দেওয়া হয়। গুণগুণ করে স্ফূর্তিতে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তারা ফিরে যায় ঘরে। অবসাদগ্রস্ত তরুণী দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্ত কাজ করে। তার মন ভরে থাকে এক অদ্ভুত পরিপূর্ণতায়। তার-ই বয়ঃপ্রাপ্ত মা অথবা মাসিও

আহ্লাদী হয়ে ওঠে। এখন সব ভাল লাগে। বাড়ি এসে তারা দেখে, বাড়ির কর্তা কপালের দু-পাশের রগে পেল্লায় সাইজের জোঁক বসিয়ে, জোঁককে রক্ত খাওয়াচ্ছেন।....প্যারিসের জন্য চিন্তায় তাঁর অনিদ্রা রোগ। এই প্যারি-বাসিদের বিশ্বাস করা যায় না। তিনিও কন্যা, এবং বধূর আহ্লাদে পুলকিত হন....

'মেসমারিজম্' কথাটা অভিধানে জায়গা করে নেয়।

শহর কলকাতায়, বাবুরা ফেরেন,....রাখণীদের বাড়ি থেকে।

আর ঠিক সময়েই বিদায় হয় নাগর-রা। বাবুরা ফিরে দেখে বিবিরা চানটান সেরে গরদের শাড়ি পরে সাঁজি হাতে রাধা-কৃষ্ণের ঘরে ঢুকছেন।....

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ, রুপোলি পর্দা থেকে ছিটকে আসা আলোতে আবছা, আবছা মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। সুসী আর দীপক আসন গ্রহণ করে। পাশাপাশি আসন। পর্দায় তখন ভিন-দেশী নায়ক নায়িকার মান-অভিমানের পালা। শেষ হেমন্তের দৃশ্য। ভিনদেশের পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নায়ক-নায়িকা সারাদিন-রাত শুধুই প্রেম করে। কাজ তাদের তিনটে, খাওয়া, গান করা আর গুঞ্জন করে প্রেম-করা। নানান তার ভঙ্গি। খালি প্রেম, কোন বকা-ঝকা নেই। নিন্দাবাদ নেই। খালি ভাললাগা আর ভালবাসা।

হঠাৎ দীপকের হাতটা এসে সুসীর হাতের ওপর পড়ে। পড়তেই পারে কারণ দুজনের বসার জায়গার মাঝখানে একটাই মাত্র হাত রাখার জায়গা। কতদিন তো এরকম হয়েছে। আজ কিন্তু সুসী চমকে উঠলো। একটা গা-শির-শির করা ভাব তার শির-দাঁড়া থেকে বয়ে ছড়িয়ে পড়লো বুকের মধ্যে। রক্তে একটা মৃদু চাঞ্চল্য। বুকের দপদপানিটা বেড়ে গেল। সে হাতটা সরিয়ে নিলো কিন্তু বিরক্ত হল না, 'প্রেম করতে হয় এই রকম!' দীপকের ফিসফিসানিতে সুসী শুধু মাথাটাই নাড়তে পারে। সে মাথা নাড়াটা কেউই দেখতে পায় না শুধু যে বলেছে সে ছাড়া! রুপোলি পর্দায় তখন উন্দামতা। চঞ্চল প্রেক্ষাগৃহ। চিত্র সমালোচক তার কলম চিবুচ্ছেন। নায়ক নায়িকা গেয়ে চলেছে....'মালটিপ্লিকেশন দ্যাট'স দ্য নেম অব দ্য গেম....এভরি

জেনারেশন প্লেজ দ্য সেম !....' গান থামে, নতুন দৃশ্যের শুরু.... । কোন একজন বে-রসিক দর্শকের মন্তব্য ভেসে আসে, 'ব্যাটারা শুধু তো প্রেমই করে যাচ্ছে....খাওয়া-দাওয়ার পয়সাটা আসছে কোথা থেকে !' সুসী ধাক্কা খায়। এবার বিরক্ত হয়। দীপকের হাতটা আবার এসে পড়ে ওর হাতে, হাতটা এবার সরিয়ে নেয় না ....দুটো বাহু একই হাতলে....দীপক ফিসফিস করে, 'আধেক আঁখিপাতে পাওয়াটা আবার পাওয়া না কি ? পেতে গেলে সম্পূর্ণ-ভাবেই পেতে হবে.... টাকা রোজগার করো রে....ছেলেমেয়ে সামলাও রে....এতে প্রেম হয়....আমি ওসবের মধ্যে নেই.... ।' সুসীও ভাবে একই কথা, বকাঝকা নেই। নিন্দাবাদ নেই....শুধুই ভাললাগা আর ভালবাসা ! প্রগলভ দীপকের বাচালতায় বিরক্ত পাশের দর্শকটা টিপ্পনী কাটে, 'ও, দাদা ! তাহলে তো জমিদার আর কালোবাজারি ছাড়া কেউই প্রেম করতে পারবে না....আপনি একটু চুপ করুন তো !'

রুপালি পর্দার নায়ক-নায়িকারা তখন শেষ দৃশ্যে....বিরক্ত দীপক চুপ করে যায়....আলো জ্বলে ওঠে....হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দর্শকরা উঠে দাঁড়ায়। সুসীও যন্ত্রের মত বসার জায়গাটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। দীপক ওর হাতটা ধরে। ওর মাথাটা ভেঙে পড়ে ....কলেজের এক চ্যাংড়া টিপ্পনী কাটে, কারণ ওরা লাইন দিয়ে বেরুতে অযথা দেরী করছে,....'সখি ! এগোন ! এগোন !' শিভালরিতে ঘা লাগে দীপকের....সে চোখ পাকিয়ে ছেলেটাকে দেখার চেষ্টা করে ...ছেলেটা ওকে একটু ঠেলে দেয় সামনের দিকে, 'গেটটা ওই দিকে ! এগিয়ে চলুন ! রাস্তা দেখুন....' দীপকের মাথাটা নীচু হয়ে যায়। সুসী হাতটা ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়.... রাস্তায় নামে দুজনেই। উজ্জ্বল আলো। হকাররা চিৎকার করছে, গাড়ির যান্ত্রিক শব্দ....ওদের ভাললাগে না, সুসীই প্রথম কথাটা বলে, 'ভালো লাগছে না ! চল কোথাও গিয়ে বসি !' দীপকও বলে, 'ঠিক বলেছিস ! চল চাইনিজ খাই গিয়ে !' আজ আর সুসী বলতে পারলো না 'ভাই-কে ছাড়া খাবো না !' এগিয়ে চলে দুজনে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীর মতই দুজনে এগিয়ে যায়....

॥ চার ॥

'আমার ভাল লাগছে না, চল না আমাদের বাড়ি গিয়ে দুজনে সারা রাত গল্প করে কাটিয়ে দিই....' সুসীর প্রস্তাবে দীপক একটু থমকে যায়। রেস্টুরেন্টেরও একটা সময়-সীমা আছে মেয়াদ আছে। মেয়াদের শেষে দুজনেই আবার উজ্জ্বল আলোর সামনে প্রশস্ত রাস্তায় মানুষের ভিড়ে। দীপককে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুসী আবার প্রস্তাবটা দেয়। হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে দীপক।' ওরে বাপস্! এখনও থার্ড পেপারটা ধরাই হয় নি। ফাস্টক্লাসটা না পেলে সব আপসেট হয়ে যাবে!'

অবাক সুসী কোন কথা বলতে পারে না। তার মুখ থেকে শুধু একটাই কথা বেরিয়ে আসে, 'মানে? এতক্ষণ....'

'আরে বোকা মেয়ে! ওসব, ওই রকম অ্যাটমসফেয়ারেই বলা যায়! বাস্তবের আলোতে ওসব বলা চলে না কি?'

'সব মিথ্যা?'—সুসী জিজ্ঞাসা করে।

'আমি তোকে ভালবাসি, এটা মিথ্যা হবে কেন? কিন্তু....' দীপককে থামিয়ে দিয়ে সুসী প্রশ্ন করে—'তাহলে তো তোর সময় ভাগ করাটা অন্যায়। খালিই প্রেম করা উচিত....তাহলে যাবি না কেন?'

'দূর বোকা! কথাটার মানেই বুঝিস নি তুই! ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে কেরিয়র গড়তে হবে। ২৫ থেকে ৩৫ রোজগার... ভবিষ্যতের জমানো সব। ৩৫ থেকে খালি ভোগ!....চলি বুঝলি? পরশু আবার আসবো!' দীপক ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ে!

হতভম্ব সুসী গাড়ি আর লোকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গোটা শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত জ্বালা! সিনেমা হলে দীপকের স্পর্শের জ্বালার সঙ্গে এই জ্বালার ফারাকটা সে বুঝতে পারে। তাতে ছিল একটা তৃপ্তির অনুভূতি। ভরে যাবার অনুভূতি। কিন্তু একী! তার মাথাটা দপ দপ করছে। হঠাৎ গা-গুলিয়ে ওঠে। রাস্তার ওপরেই বসে পড়ে বমি করতে। দু-চারজন পথচারি যারা ওকে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুতে দেখেছিল তারা বিদ্রূপের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে ওর যন্ত্রণা। এই অঞ্চলের হকাররা প্রতিদিনই এই

দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। কোন ইতর বিশেষ হয় না তাদের অভিজ্ঞতায়। দু-একজন টিপ্পনী কাটে 'নয়া মুরগী! লাইনে নতুন এসেছে!' সুসী কিছু শোনে না। কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না, শুধু একটা জ্বালা! মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে শুধু একটাই কথা 'বদলা!' দীপককে এই এইখানেই অপমান করতে হবে···।

আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির দিকে রওনা দেয় সে। সুসীর অনিচ্ছা থাকলেও উপায় নেই, রাস্তা যদি ঠিক থাকে, দিক যদি নির্ভুল হয়, পথ পথিককে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেই। সুসীও বাড়ি এসে পৌঁছায়। বুঝতে পারে ওপরে বাবা অপেক্ষা করছেন। কড়া নাড়তেই ছোট-ভাইটা এসে দরজা খুলে ওকে দেখে পিছিয়ে যায়। ভাইকে পাশ কাটিয়ে সুসী ওপরে ওঠে। সিঁড়ির মুখেই বাবার সঙ্গে দেখা। বাবাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ধাক্কা মেরে বাবাকে সরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। স্তম্ভিত বাবা পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে সামলে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন দরজাটার দিকে। কী হয়েছে বোঝার চেষ্টা করেন! এই মেয়েটাকে ঘিরে তাঁর কত স্বপ্ন। চোখের ওপর মেয়েটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাঁর কিছুই করার নেই,—'নাঃ এ চলতে দেওয়া যায় না!'

জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দিতে থাকেন। প্রথম কয়েক মিনিট কোন উত্তর নেই। বাবা ভাববার চেষ্টা করেন, 'কী হল? আত্মহত্যা করলো না তো?' আবার দরজায় ধাক্কা মারেন তিনি। হঠাৎ দুম করে দুম করে দরজা খুলে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় সুসী বেরিয়ে আসে। দু-চোখে হাত চাপা দিয়ে উলঙ্গ কন্যার লজ্জা বাঁচান। ছুটে নিজের ঘরে চলে আসেন, উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকেন।

আবার একবার ভাববার চেষ্টা করেন, 'কী হল? মানি আন-স্পেন্ট ইজ মানি সেভ্ড্···খরচ না করাটাই তো রোজগার করা। জমছে কোথায়? এই মেয়েটার সৌন্দর্য, কৌমার্য সব তো জমার ঘরে থাকার কথা।···' হিসাবের খাতাটা টেনে নেন · হিসাব মিলছে না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে···নীচে টেলিফোনটা বেজে

ওঠে…অন্যদিন হলে সুসীই সমস্ত টেলিফোন ধরে। ডাক্তারবাবু নিজেই ছোট ছোট পা ফেলে ফোনটা ধরতে এগিয়ে যান…তাঁর বংশ গৌরব, তাঁর আভিজাত্য · সিঁড়ির ধাপে পা রাখেন তিনি। গুণে গুণে নামছেন · হঠাৎ বহুদিনের না-মেরামতি করা পলেস্তরার একটা টুকরো ভেঙে পড়ে চমকে উঠেন · একটু হলেই মাথাটাতেই পড়তো ? আস্তে করে পলেস্তরার টুকরোটা তুলে নেন, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে…পা দিয়ে চুন বালি সরিয়ে এগিয়ে যান…

'হ্যালো ! হ্যাঁ বলছি ?…কী বললে ? ব্লুফক্স থেকে বেরিয়ে… রাস্তায় বমি করছিল ড্রাংক ? কিন্তু ?' ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে যায়। টেলিফোনটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন অকাল বৃদ্ধ ! রাগে ঘৃণায় বাকরুদ্ধ, 'নাঃ এর একটা বিহিত করতেই হবে !' এবার বড় বড় পদক্ষেপে বেশ শব্দ করেই তিনি ওপরে উঠে আসেন।

'সুসী ! বেরোও !' দরজা ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব গলা চড়িয়ে ডাক্তারবাবু ডাকতে থাকেন। অনেকক্ষণ ধাক্কা-ধাক্কি করার পর দরজা খুলে সুসী পিতার মুখোমুখি হয়। রাত গড়িয়ে চলে…

'তুমি কোথায় ছিলে ?' পিতার কৈফিয়ত তলব !

'সব কথা তোমাকে বলতে হবে না কী ?' মেয়ের সাফ জবাব, 'শোন বাবা, বাবা-গিরি ফলাতে এসো না !'

এরকম একটা উত্তরের জন্য বাবা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু তিনি পণ করেছেন আজ একটা ফয়সালা করতেই হবে, 'বাড়িটা আমার, এখানে তুমি রাত দুপুরে মদ খেয়ে ঢুকবে তা চলবে না ' বাবা চিৎকার করেন !

'বেশ করেছি খেয়েছি ! তাতে তোমার কী ! তোমার পয়সায় তো খাই নি ! আর বাড়ি দেখাচ্ছো ? জন্ম দিলে তো এটুকু করতেই হবে ! এক মহিলার সঙ্গে শোবার এইটুকু দাম দেবে না ?…'

দু-হাতে কান চেপে বসে পড়েন বৃদ্ধ ডাক্তার…'এ কী কথা ? মাতাল ?' বসে বসেই বিড় বিড় করে বলেন, 'কুমারী মেয়ে রাত

দুপুরে মদ খেয়ে ফিরবে....কিছু বলা চলবে না....' বাবার কথার উত্তর দেয় কন্যা, বেশ চিৎকার করেই উত্তর দেয়, 'কুমারী মেয়ে? কৌমার্য রক্ষার জন্য কোন দিন একটা কাপড়, একটা চাদর কিনে দিয়েছ?.... ওসব বলতে এসো না? যাও ঘরে গিয়ে হিসেব দেখ!....'

ডাক্তারবাবু হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে। কী বীভৎস লাগছে ওকে, অমন সুন্দর চোখ দুটোকে কী বিশ্রীভাবে গোল গোল করে ঘোরাচ্ছে....যাত্রার মেয়েদের মত ঝগড়া করছে হাত-পা নেড়ে....এবার তাঁর গা গুলিয়ে ওঠে....বেশ বুঝতে পারেন আশপাশের বাড়ির জানালায় কান পেতে আছে প্রতিবেশীরা....। মেঝেটা ধরে কোন রকমে উঠে দাঁড়ান তিনি। বাবাকে উঠতে দেখে সুসী আবার চিৎকার করে, 'শোন, যে-শুয়োরের বাচ্চারা তোমাকে জানিয়েছে তারা ঠিক বলে নি! মদ আমি খাই নি....'

ডাক্তারবাবু দেওয়ালটা ধরে এগিয়ে যান নিজের ঘরের দিকে.... পুরনো দেওয়ালে তাঁর হাতের ছাপ পড়ে....। হিসেব মিলছে না ডাক্তার দত্তর!

বাবা চলে যাচ্ছে দেখে সুসী আবার চিৎকার করে, 'শোন, কাল থেকে আমি তোমাদের রান্না করতে পারবো না! আই অ্যাম নট্ ইওর মেইড-সারভেণ্ট!...'

'পড়াশুনাও করবে না, রান্নাও করবে না, তাহলে তুমি কী করতে থাকবে; গিলবে কী করে?...' বৃদ্ধের জবাব। 'খাবার খোটা দিচ্ছো! ওই তো খাবার ছিরি! দু-বেলা খালি কাটা মাছ আর ভাত! যাও খাবো না...আমি কাজও করবো না, খাবো-ও না।' নিজের ঘরে ঢুকে আবার দরজাটা বন্ধ করে দেয় সুসী!

অনেকটা সুস্থ বোধ করে সে। বাবার সঙ্গে চেঁচামেচিটা তাকে সুস্থ করে তুলেছে। গায়ে কোন রকমে জড়ানো শাড়িটা খুলতে খুলতে বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'দূর ছাই! কাম্বারসাম! এ-সব যে কেন পরে? কালকেই একটা নাইটি জোগাড় করতে হবে! শাড়িটা না-খুলে আবার কোন রকমে জড়িয়ে নেয়। কয়েকটা ফোন করতে হবে...প্রথমেই নীলুকে! অভিজাত পরিবারের নীলোৎপল বারিক। পড়াশুনাতে বেশ ভাল। একটা সরকারি স্কুল থেকে ভালভাবে

পাশ করেছে। কেমিস্ট্রির ছাত্র। নীলোৎপলের মুখটা মনে পড়ে সুসীর। একটু হিংসুটে আছে। সুসীর দিকে কেমন এক গুণ-মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দাদু ছিলেন কেমন একটা রাজা। বিশাল বড়লোকের ছেলে, সুসীর মনে হয়, ২৪ ঘণ্টা প্রেম করবে··· শুধুই ভাল ভাল কথা বলবে এর জন্য আদর্শ ছেলে নীলোৎপল। কিন্তু কেমন ষন্ডা-গণ্ডা। এক্সারসাইজ করে। বড্ড বেঁটে একটু দ্বিধায় পড়ে যায় সে···তাহলে? রূপম? বেশ সুঠাম চেহারা, হাইট-টাও ভাল, টকটকে ফর্সা রঙ। কতকটা গ্রেগরি পেগের মত দেখতে···সে-ও চায় সুসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা! ডাক্তারি পড়ে···বড্ড ব্যস্ত···'হাড় কৃপণ' সুসী ভাবে। একমাত্র বই ছাড়া কোন দিন কিছুই দেয় নি ওকে। থাক রূপমও থাক···। ব্যাটা আবার বড় বড় কথা বলে। মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করে। প্রায় সুসীকে সাবধান করে দেয়, 'সত্তর সালের পরের এই ছেলে-গুলো যে কী সাংঘাতিক তুই জানিস না সুসী! এদের স্লোগান ফাস্ট-লাইফ! ভোগ···ভোগ···আর ভোগ···কোন দায়িত্ব, কোন দায় এদের কাছে অসহ্য,···' বেশীর ভাগ দিন ই রূপমকে ও কথা শেষ করতে দেয় না, 'খালি জ্ঞান! চুপ কর তো! দুটো ভালো কথা বলতে পারিস না। মারলিন মনরোর রেট্রো এসেছে দেখাবি তো বল।' রূপমের এই কোনঠাসা অবস্থা বাকী বন্ধুরা উপভোগ করে। দীপকটাই সব থেকে বেশী ওর পেছনে লাগতো, 'যাও তো! তোমার জন্য তো সুসীর চিলে কোঠা আছে। ওখানে বসে সত্তরের শোনা গলপগুলো বলো! উত্তেজনার আগুন পুইয়ো। ···তাহাতে সত্তরের দশকেও ফোর্ট উইলিয়মের একখানি ইষ্টকও খসে নাই···তুমিও পারবে না···।' বাকীরা কফি হাউস কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। দীপকের কথা বলার ঢঙে, সুসীর খারাপ লাগে কিন্তু হাসিতেও যোগ দেয়। নীলু বলে, 'গুরুদেবকে তো বেশ জুতসই ঝেড়েছিস মাইরি!' সুসী মনে মনে মুখস্ত করে নেয় উদ্ধৃতিটা। সুসীও জানে, এরাও জানে এদের জ্ঞানের বহর কতদূর! পড়াশুনাতে এদের তীব্র আপত্তি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যা কিছু বলে বেশীর ভাগটাই বিভিন্ন লোকের কাছে শোনা। সুসীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে এই রকমই একটা অপ-সঞ্চয় জমা হয়।

রূপম চুপ করে যায়···· । আড্ডা ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছা করে পারে না। সমর্থনের আশায় সুসীর দিকে তাকায়···· । দীপক, নীলু, তপন প্রত্যেকেই তখন সুসীর হাতটা টেবিলে ফেলে সুসীর ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছে····কী ভেনাস! তুই শিল্পী হবি-ই। কী রোমান্টিক···।' একজন হাতটা টেনে কড়ে আঙুল আর অনামিকার সঙ্গে ঠেকিয়ে দেখায়, 'কিন্তু দেখ এদিকে আবার দেবগণ···' দাঁড়া কালকেই তোকে একটা খাঁটি মুক্তোর আঙটি এনে দেবো ' রূপম দেখে, একটা জ্বালা অনুভব করে···। কোন রকমে বলে, 'না ভাই আজ উঠি। আজ ক্লিনিক না করলে ডি. কে ব্যাক করাবেই···।' আড্ডাধারিরা কেউ সমর্থনও করে না, ওকে থাকতেও বলে না। অনিচ্ছুক পা-টাকে টানতে টানতে প্রায়ই সে বেরিয়ে যেত কফি হাউস থেকে। এরা কেউ-ই লক্ষ্য করতো না।

সুসী ভাবে রূপমকেও দরকার। ভাবতে ভাবতেই ফোনটা তুলে ডায়ালের গর্তে আঙুল ঢোকালো,···দিদিকে ফোন করতে আসতে দেখে ছোট ভাইটা যে কখন পেছন পেছন এসে হাজির হয়েছে, সুসী নজর করে নি।

গোটা দুই নম্বর ঘুরিয়েছে এমন সময় ভাই ডাকলো, 'দিদি!' বিরক্ত হয়ে সুসী ওর দিকে তাকাল। দিলো সব চিন্তাটার রেশ কেটে দিল! নীলু হলে বলতো 'ব্যাক-কিক্ করলে বাবা!' ভাই-এর দিকে না-তাকিয়ে বিশেষ কায়দা করে আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতেই সে উত্তর দেয়, 'কী?'

'খেতে দিবি না! রাত দেড়টা যে বাজে!'

'না, আমি পারবো না! আই অ্যাম নট ইওর মেইড-সারভেণ্ট! আমার আমিকে, আমি কোথাও ভাগ করে দিতে পারবো না···' কথাগুলো বলেই তার মনে হয়, সে কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত যতজনের ছেলেপুলে আছে, তাদের প্রত্যেকের চেয়ে সুন্দর ছেলে-মেয়ের মা হতে চায়! 'অমন কী হবে?···' ওপ্রান্তে রিঙটা বেজেই যাচ্ছে···· 'ন্না আমি, আমি-ই থাকবো! সুন্দর ছেলে-মেয়ে অবশ্যই চাই তা বলে ?'

'হ্যালো!' সুসীকে আর চাইনিজ পাজ্‌লটা সমাধান করতে হল না। ও প্রান্ত থেকে কে-যেন কথা বলছে? 'নীলু! আমি

সুসী বলছি? ···জানিস আজ দীপক আমাকে যা তা করেছে··· সে আমি বলতে পারবো না···হ্যাঁ সে তো তুই বলেইছিলি···ওর সঙ্গে মেলামেশাটা একটু কম করিস···কিন্তু কী করবো বল··· পারলাম না! কী বললি? পারমিসিভ-সেক্সের যুগ ওতে তুই কিছুই মনে করিস নি···আঃ নীলু ঃ কী যে শান্তি পেলাম!···'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ···মনে আবার থাকবে না···জ্যাঠামনির সেই কথাটা তো তুমি নিজে যে দোষ করবে···যে অন্যায় করবে···জোরগলায় চিৎকার করে···তোমার বিপক্ষের চরিত্রের এবং কাজের ওপর সেটা চাপিয়ে দেবে···ঠিক বলেছি না? থ্যাঙ্ক য়ু ফর কমপ্লিমেন্ট! মেমরিটা আমার একটু বেশী শার্প; ···একটা শিক্ষা তো ওকে দিতেই হবে···কী বললি ছেড়ে দেবো! য়ু্য কাওয়ার্ড! 'ঠিক আছে আমি দেখছি রূপমকে বলে মেডিকেলের ছেলেদের দিয়ে ও কিছু করতে পারে কী না···'

···ওঃ তাহলে আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল···কিছু মনে করিস না···হ্যাঁ···পরশু ও আসবে···আমি যাবো না সিনেমায় বলছিস কিন্তু এলিজাবেথ টেলর···? ঠিক আছে যাবো না···আমি আর তুই দাঁড়িয়ে থাকবো···তারপর ও বেরুলেই অ্যাকশন!···থ্যাঙ্ক য়ু্য! লক্ষ্মী ছেলে! ভালো করে কেমিস্ট্রি পড়ো মিথস্ক্রিয়া আর মিথুন-ক্রিয়ার সম্পর্কটা বোঝো···' একটা প্রাণ-খোলা হাসির সঙ্গে ওপারের ফোন কেটে যায়। ফোনটা রেখে সুসী তাকিয়ে দেখে ভাই তখনও দাঁড়িয়ে। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতেই সে খপ করে দিদির শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরে, 'তুই যে দীপকদার সঙ্গে বেরিয়েছিলি—চাইনীজ আনিস নি!' 'না! আমি কী ভিখারি না কি! নাকি তোমরা ভিখারির ছেলে, আমি চেয়ে চেয়ে তোমাদের চাইনিজ খাওয়াবো, রেডিও দেবো···জন্মদিন করবো···!'

'ওঃ তাহলে বুঝেছিস!' বলে কিশোর এবার দিদিকে একরকম ধাক্কা মেরেই এগিয়ে যায়। প্রথম ধাক্কা খেয়ে সুসী খেপে যায়, 'শোন! আমি তোদের মেইড্ সারভেন্ট নই···আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবি না···'

'তুই তাদের থেকেও অধম!' উপরের ঘরের সিঁড়ির দিকে যেতে যেতেই কিশোর জবাব দেয়, 'তারা তো খেটে খায়! তুই

লোক ঠকাস!' সুসী ছুটে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ভাই-এর গালে। দিদিকে ঠেলে দেয় সে। পাশের বাড়ি থেকে কে যেন চিৎকার করে ওঠে, 'আবার শুরু হল দত্ত বাড়ির কাজিয়া এবার ভাই-বোনে।' সুসী চিৎকার করতে থাকে, 'যখন দিতে পারি ··ভালো ··' 'তখনও তোকে ঘেন্না করতাম, এখনও করি··· !'

মাথা নীচু করে সুসী ওপরে উঠতে থাকে···। সকলে তাকে ঘেন্না করে···

॥ পাঁচ ॥

ফরাসি দেশের অভিজাতরা রাস্তায় নেমেছেন···ডাঃ মেসমারের শাস্তি চাই! ওর হাসপাতালকে পাত্তাড়ি গোটাতে হবে···তারা একদিকে রাজার কাছে আর্জি করে··অন্যদিকে আক্রমণ করে মেসমারের হাসপাতাল। ঝনঝন করে কাঁচের দরজা-জানালা ভেঙে পড়ে ··গোটা বাড়িটার রঙ খসে পড়ে ··দূর থেকে তাদের বাড়ির মেয়েরা সেই ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখে ··একটা বুক-চেরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে···' 'কত সুখী ছিলো তারা ঐ বাড়িটাতে···কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেছে ' অভিজাতদের ঘরে ঘরে গর্ভবতী কিশোরী · মেরি-মাকে সহ্য করা যায় কিন্তু দেশের আইন অবিবাহিতা গর্ভবতীকে অভিজাত বলে কী করে? সমগ্রদেশে আইন শৃংখলার প্রশ্নে, নীতিবোধের প্রশ্নে একটা চ্যালেঞ্জ! ডাঃ মেসমার সপারিষদ ধনরত্ন সহ পালিয়ে যান····অভিজাত পল্লীতে ঘরে ঘরে কাঁদতে থাকে কিশোরী-গর্ভিণী!

সুসী ভাল নেই! যা খায় বমি করে। প্রচণ্ড রক্তাল্পতায় ভুগছে। কিছুই খেতে পারছে না। মুখে শুধু একটাই কথা, 'আমার ভাল লাগছে না! আমার অসুখ করেছে!' নামী-দামী ডাক্তাররা ওকে পরীক্ষা করেন। কোন ক্লিনিকাল ডায়োগনিসিস হয় না। নির্দিষ্ট কোন লক্ষণের কথাও সে বলতে পারে না। ডাক্তাররা সকলে একবাক্যে রায় দেন, 'ডিপ্রেসন!' নানান ধরণের মেটাবলিক ইনজেকশন দেওয়া হয়····ডাক্তার বাবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, তার মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনি জানেন রোগের নাম কী? বলতে পারছেন না। কফি হাউসের আড্ডাটা চলে সুসীকে

বাদ দিয়েই। সুসী ভাবে ছেলেরা নিশ্চয় আর কাউকে জোগাড় করে নিয়েছে। বুকের ভেতরটা চিন চিন করে ওঠে। আড্ডা-ধারিদের প্রত্যেকেই নিশ্চিত-জীবন গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে একে একে। একমাত্র নীলুটাই ওর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে। প্রায় প্রতিদিনই সে আসে। সুসীর মাথার কাছে বসে, বন্ধুদের খবরাখবর বলে চলে। প্রতিদিনই সুসীর পছন্দমত কোন জিনিস হাতে করে আনে....বক বক করে চলে ওরা, তবুও সুসীর ভাল লাগে না।

'সেদিন কেমন ক্যালালাম বল দীপককে?' নীলু সমর্থনের এবং প্রশংসার আশায় তাকিয়ে থাকে সুসীর দিকে....

'বাপ্‌স্‌! আমার-ই তো ভয় লেগে গিয়েছিল! তুই যেরকম লাফিয়ে লাফিয়ে বেল্ট চালাচ্ছিলি....উফ্‌....উয়াক....' সুসীর গা-টা গলিয়ে ওঠে, পেটে একটা মোচড়....। নীলু ওকে ধরে আস্তে আস্তে বাথরুমের দিকে নিয়ে যায়। একটু ওয়াক-ওঠে, কিছুটা জল! চোখে মুখে জল দিয়ে সুসী তাকিয়ে দেখে নীলুকে, 'বড্ড বেঁটে! কী গুলি গুলি সব হাত-পা?' মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'রূপমের খবর কী রে!'

সুসীর ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই নীলু উত্তর দেয়, 'শুয়োরের বাচ্চা!' নিজের বিছানায় গা-টা এলিয়ে দিয়ে সুসী প্রশ্ন নিয়ে তাকায় নীলুর দিকে, নীলু বলে, 'শালা, দু নম্বরী! মেডিকেল ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিল পরীক্ষা বয়কট করবে। রূপম সেই অ্যাকশন কমিটির সম্পাদক হলো। সরকার হুমকি দিল, যারা পরীক্ষা দেবে না তাদের ফেল বলে ঘোষণা করা হবে। হুমকিতে শতকরা ৪০ জন ছেলে পরীক্ষায় বসে গেল। তোমার বিপ্লবী রূপম, সম্পাদক, রূপমও গোপনে পরীক্ষাটা দিয়ে দিলেন....সম্পাদক পাশ করলেন, পি-জি-তে হাউজ-স্টাফশিপ বাগিয়ে নিলেন....বাকী ছেলেরা ব্যাক পেয়ে এখনও ঘসটাচ্ছে....।' সুসী অবাক হয়ে যায়, 'সত্যি বলছিস?'

'একশ ভাগ সত্যি!' নীলু উত্তর দেয়, 'শালা ৭৩ সালের নক্‌শালগুলোও দেখছি দু নম্বরী হয়ে গেছে!'

এবার ফুঁসে ওঠে সুসী, 'বোকার মত কথা বলিস না তো!

আমার সম্পর্কে এক দাদা এখনও জেলে আছে! খবর পেলাম কালকেই ওদের জেলে 'পাগলি করে তিনজনকে মেরেছে···সকলেই তো কফি-হাউস নকশাল নয়।' নীলু চুপ করে যায়। সুসীর অসুখটা হঠাৎ বেড়ে যায়।

'কিছু ভাল লাগছে না রে নীলু, তুই আজ যা!'—নীলু যাবার জন্য উঠে পড়ে।

ডাক্তারবাবু আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, সকলে মিলেই সিদ্ধান্ত নেন, ওকে কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে পাঠাতে হবে, রোগ মুক্তির জন্য ভার মুক্তির জন্য।

॥ ছয় ॥

সুসী চলে যায় পশ্চিমে, হাওয়া বদল, পরিচিত মুখগুলো থেকে বদল। নীলু ওকে গাড়িতে তুলে দেয়। সাবধানে থাকতে বলে। সুসী ঘাড় নাড়ে, তাকিয়ে দেখে, বড্ড বেঁটে! রিচার্ড বার্টন, গ্রেগরি পেগ! কী হাইট কী স্বাস্থ্য···।' মুখটা ফিরিয়ে নেয় সে। ট্রেন ছাড়ে···

নীলু ফিরে আসে রাস্তায়, দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাসও চলে যায়। মাঝে মধ্যে সুসীর খবর আসে ডাক্তারবাবুর কাছে, দীর্ঘপত্র দেন সুসীর আশ্রয়দাত্রী। সুসী খুব ভালো আছে। মনে ফূর্তি জেগেছে। ওজনও বাড়ছে, আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক সুদর্শন সরকারি আমলার সঙ্গেই বেশী মেশে। ছেলেটা বেশ ভালো।···নীলু শোনে, বুকের ভেতরটা চিন চিন করে। মুখে কিছু বলে না।·· ও এসে মাঝে মধ্যে খবর নেয়···

একদিন খবর আসে সুসীকে কেন্দ্র করে এলাকার একদল ছেলের মধ্যে মারামারি হয়ে গেছে···সুসী সেই সরকারি আমলার সঙ্গে উত্তর ভারত বেড়াতে গেছে। এতে ছেলেটার পশ্চিমা বামুন বাবা মা ভীষণ অসন্তুষ্ট। ছেলেটা কিন্তু দৃঢ় আছে·· নীলু চিঠিটা পড়ে। সুসীর বাবার দিকে তাকায়। তিনি চাপা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আবার!' নীলুর বুকটা যন্ত্রণা করে! মাথা ঘোরে···

কয়েকমাস পরে, স্বয়ং সুসীরই চিঠি আসে, 'বাবা আমাকে নিয়ে যাও। আমার ভাল লাগছে না। শর্মার বাড়ির লোকেরা আমাকে মার ধোর করছে আমার ভাল লাগছে না…' নীলু লাফিয়ে ওঠে। 'জ্যাঠামশায় কালই চলে যান…' বৃদ্ধ বাবা শুধু বলেন, "সেই একই রোগ, ভাল লাগছে না…কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না' ··আমি তো কোন মেসমারিজম্ জানি না কী করবো ?"

ডাঃ মেসমার নেই··জালিয়াতি এবং ব্যাভিচারিতার অভিযোগ ইতিহাস থেকে নির্বাসিত। কিন্তু আজও যখন কোন অনূঢ়া কন্যার ভাল লাগে না, ইতিহাস না জেনেই তার বিরক্ত বাবা বলে ওঠেন, আমি তো কোন মেসমারিজম্ জানি না…

॥ সাত ॥

কলকাতায় যখন সুসী ফিরে আসে…শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ সে। হাঁটু ভেঙে পড়া চুল, রঙ ফেটে পড়ছে। এমনিতেই সে সুন্দরী ছিলো, সেই সৌন্দর্য যেন দশ-বিশ গুণ বেড়ে গেছে। নীলু তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কিন্তু মুগ্ধতা নেই। সুসীও লক্ষ্য করে নীলু পাল্টে গেছে। আবার কফি হাউসে যাতায়াত শুরু করে। পুরানো আড্ডাধারীরা কর্মব্যস্ত! মাঝে মধ্যে নীলুই এসে বসে ওর টেবিলে। কারণ ও এখনও চাকরি পায় নি। গোটা কফি-হাউসটাই পাল্টে গেছে। এলিজাবেথ টেলর, মাইকেল জ্যাকসন নিয়ে কেউ আলোচনা করছে না। নীলু একদিন বলে, 'উৎপলেন্দুর মুক্তি চাই দেখেছিস!' টেবিলে টেবিলে একটাই আলোচনা 'মুক্তি চাই!' সুসী ভাবে 'কাদের ?'

'জানিস! দেশের হীরের টুকরো ছেলেগুলো জেলে পচছে! আর আমরা কি না আড্ডা মারছি, খাচ্ছি ছিঃ ছিঃ…' দীপক অনেকদিন পরে কফি হাউসে এসেছে। বাইরে কোথায় যেন একটা সাত-হাজারি চাকরি করে। হবু-শ্বশুরের টাকায় আমেরিকা যাচ্ছে ট্রেনিং নিতে। ঘোষণাটা তারই। সুসী তাকিয়ে দেখে দীপককে। দীপকও সুসীকে। অবাক হয়ে ভাবে এই ছেলেটাই না বলেছিল… 'কী আর হলো ? ফোর্ট উইলিয়মের একখানি ইষ্টকও খসিল না!'

'তুই কী ভাবছিস আমি জানি সুসী! ভাবছিস! ফোর্ট

উইলিয়মের ইঁট কি তাহ'লে খসেছে? তাই না বল?' সুসী মাথা নাড়ে। 'শোন ওরা বাইরে থাকলে খসবে! খসবেই! ওরা দেওয়াল-কাটা পোকা! কেমন জেল ভেঙে বেরিয়ে গেল দেখলি না?' সুসী শুনে যায়। রূপম এসে যোগ দেয়, 'এই চল আজ বন্দীমুক্তির মিছিল!' এবার সুসী ফুঁসে ওঠে, 'তারপর তুই পালাবি তো? পুলিশের দিকে চলে যাবি তো?' রূপম বিড় বিড় করে বলে, 'বিয়ে করেছি জানিস!' সুসী রেগে যায়, কী প্রশ্নের কী উত্তর!

গোটা কফি হাউস জুড়ে জোর তর্ক। মিছিলের স্লোগান কী হবে! 'ওই দিতে হবে, দিতে হবে চলবে না!'

কোন টেবিল থেকে উত্তেজিত কোন তরুণ টেবিল চাপড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এত আবেদন, নিবেদনের কী আছে? চল একটা স্কোয়াড গড়ে ওঁদের ছিনিয়ে আনি!' চারদিকে টান টান উত্তেজনা। বৃদ্ধ শিল্পী এক কোণে এক কাপ ব্ল্যাক কফি সামনে রেখে একটার পর একটা ছবি এঁকে চলেছেন। তাঁর তরুণী সহকর্মিণী টেবিলে টেবিলে বিক্রী করে বন্দীমুক্তি তহবিলের টাকা তুলছেন। তাঁরই পাশে কয়েকটা টেবিল জুড়ে নব্য-কবির দল বন্দীদের উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠ করে চলেছেন। তাঁরা কেউই হয়তো একজনও বন্দীদের চেনেন না, জানেন না।

সুসী ভাবে অদ্ভুত ব্যাপার তো, এলিজাবেথ টেলর-রেষ্ট্রো নয়, রিচার্ড বার্টন নয়, লেলন-জ্যাকসনও নয়, কতগুলো জেল-বন্দীদের নিয়ে কফি হাউস কাঁপছে।

চারপাশের থর থর উত্তেজনার সঙ্গে সেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার ভাল-না-লাগা ভাবটা কাটতে শুরু করে। মিটিং, মিছিল, সই সংগ্রহ, তর্ক এসবের মধ্যেই ডুবে যায়। কত ভালো ভালো বিদেশী ছবি এসে চলে যায়—কেউই সে-সবের খোঁজ রাখে না। টেবিলে, টেবিলে, পরিচিত একজন একজনকে দেখলে খোঁজ নেয়, 'কলকাতা-৭১ দেখেছিস! যুক্তি-তক্ক গপ্পো। হাজার চুরাশির মা পড়েছিস!'

বৃদ্ধ শিল্পী চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কলকাতা-৭১ দেখতে হবে না হে! ৭১-এর কলকাতাকে বন্ধনমুক্ত করে আনো। চলো আমরা সকলে হাজার পঁচাশি হই!' সুসীর ভাল লাগে কথাটা। পড়াশুনা করে কোন কিছু জানার অভ্যাস ওর চলে গেছে। টেবিলে, টেবিলে ঘুরে

চোখা চোখা কথাগুলো মুখস্ত করে নেয়। তারপর জুত-সই আওড়ে যায়…। ওর বৃদ্ধ বাবা খেয়ালই করেন না। তিনি হিসাব করে চলেন। খরচ না-করাটাই রোজগার করা…ভাবতে থাকেন। সংসারের খরচে টান পড়ে। বাজার থেকে ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ ডাক্তার হিসাব মেলান। 'ইস! এতগুলো টাকায় এই বাজার!' বাবার কথা শুনে এক অব্যক্ত ঘৃণায় সুসীর গা রি-রি করে ওঠে সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'এত যদি খরচের ভয় বাজার যাও কেন?' বাবার মেজাজও তিরিক্ষি, 'গিলবে কী?'

'খাবার খোঁটা দিচ্ছো! এই রইলো তোমার খাবার! ‥' হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ওঠে সুসী। বৃদ্ধ ডাক্তার হতভম্ব হয়ে যান। তিনি জানেন এর জের চলবে বেশ কিছুদিন। সেই ক'দিন সকাল থেকে রাতদুপুর পর্যন্ত সুসী ঘুরে বেড়াবে। বিকেল পর্যন্ত ঘুমুবে। পশ্চিম থেকে ফিরে এসেই এই উৎপাতটা শুরু হয়েছে। বাবাকে দেখলেই ওর সেই 'ভাল-না-লাগা' রোগটা ফিরে আসে। আসলে পরিচিত কাউকে দেখলেই এই রোগে আক্রান্ত হয় সুসী। তখন মনে মনে তার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে থাকে। তার পরিচিত সকলেই ব্যক্তি-জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ তো আবার নামী-দামীও হয়ে গেছে।

একটা আটপৌরে শাড়ি পরে, হাওয়াই পায়ে উদ্দেশ্যেহীনভাবে দুপুর রোদে হাঁটতে থাকে সুসী। রূপম, নীলু দীপক সকলেই বিদেশে পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত। 'আমার কী আছে?' ভাবতে শুরু করে। 'অথচ আমি তো ওদের থেকে ছাত্রী হিসাবে মোটেই খারাপ ছিলাম না।…সুন্দরী বলেই সকলে তোয়াজ করে চলেছে এতদ্দিন। যা বলেছি শুনেছে…কেন এমন হল? অথচ এমনকি বংশগৌরবেও আমি তো ওদের থেকে উঁচুতে…'

কলকাতার প্রশস্ত রাজপথ মানুষকে একা আত্মকুণ্ডয়ণের সময় দেয় না। তারই মধ্যে ও নিজেকে সরিয়ে নেয়। ভাবতে থাকে সদ্য-ফেলে-আসা জীবনটা, 'আরে! মেয়েটা মাতাল নাকি?' ধাক্কা-খাওয়া এক প্রায়-বৃদ্ধের মন্তব্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জবাব দিতে গিয়ে দেখে ভদ্রলোক অনেকটা দূর চলে গেছে। 'ইস! যুৎসই একটা জবাব দেওয়া গেল না!' উত্তেজনাটা আরও বেড়ে গেল।

সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। তার ওপর অপমানের জ্বালা সব মিলিয়ে একটু ক্লান্ত বোধ করে সে। হাঁটিতে হাঁটিতে চলে আসে বাগবাজারের ঘাটে।

ফাঁকা ঘাট। দুপুর গড়িয়ে গেছে। স্নানার্থীদের ভীড় নেই বললেই চলে, দু-চারজন সপরিবারে দখল করে নিয়েছে ঘাটের বিশাল চাতালটা। চাতালে তাদের কাপড় শুকাচ্ছে। একটা ভেজা হাওয়া এসে সুসীর চোখে মুখে লাগে, 'আঃ' কোনদিক না-তাকিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় গঙ্গার দিকে। গঙ্গা বয়ে চলেছে। একই জল গঙ্গা দুবার বয় না! তাহলে এই আবর্জনা ভর্তি জলগুলো যায় কোথায়? আবর্জনা বয়ে এনে সেই আবর্জনা জনপদে ছড়িয়ে দিয়ে উনি কেমন পবিত্র হয়ে আছেন? শেষ সিঁড়িতে বসে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে সুসী ভাবে, 'ব্যাপারটা মন্দ নয় তো? হুম! নিজের আবর্জনাগুলো অন্যের ঘাড়ে চালান করে দিতে পারলে কেমন হয়?'

গঙ্গার বুক ছুঁয়ে এক ঝলক বাতাস ওকে শান্ত করে। সিঁড়ি ভেঙে উপরের দিকে উঠতে উঠতে সে কব্জিটা উল্টিয়ে দেখে নিল। ঘড়িটা ও কব্জার নিচে পরে। তিনটে পঁচিশ। সাড়ে চারটে, পাঁচটার আগে নীলুরা কেউ কফি হাউসে আসে না আজকাল। সে হিসাব করে দেখল এখান থেকে হাঁটতে শুরু করলে মোটামুটি সময়টা কেটে যাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে, 'প্রত্যেকের কাজ আছে। শুধু আমার নেই, আমি যেমন কাজ চাই সেটাই নেই, না, বাবা ঘড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবো না। আমি ইচ্ছার অধীন···' সদ্য তাসের দেশ দেখেছে ওরা সকলে মিলে। ইচ্ছাটা সে আড্ডাতে ব্যক্তও করেছিল। নীলু, রূপম এক-সঙ্গে হো, হো করে হেসে উঠেছিলো ওর কথায়! 'তাহলে তো তোকে হয় একটা মাড়ওয়ারি কালোবাজারিকে কি 'বা রাজস্থানী মহারাজাকে বিয়ে করতে হবে···' প্রথম কিলটা খেয়ে সুসী হজম করে নেয়। কিন্তু মেনে নেয় নি, ওরা সকলে কেমন বিমর্ষ, নীলু বললো, 'দেখ সুসী পৃথিবীতে তোর আমার ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়ে অনেক অনেক বেশী দুঃখ আছে,···তুই জানিস আজকেই একটা ছেলেকে নাটক করার অপরাধে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে

কার্জন পার্কে। আমরা শুধু খবরটার কনফারমেসনের জন্য অপেক্ষা করছি…যদি সত্যি হয় আজ-ই কলকাতা অচল করে দেবো আমরা…তুই বরং বাড়ি চলে যা '। একটা নতুন উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে সুসী চনমন করে ওঠে। মনে মনে সে কামনা করে, 'খবরটা যেন সত্যি হয়'। মুখে বলে, 'না, আমি তোদের সঙ্গে থাকবো। তা ছাড়া বাড়িতে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সেই সাত সকালে না-খেয়ে বেরিয়ে এসেছি!' 'ওঃ, সে তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার! বাবাকে দেখলেই ঝগড়া! চার্লির সিগারেট ছাড়া আর কী! আসলে তুই নিজেকে উত্তেজনা ছাড়া রাখতে পারিস না! চলিস প্রবৃত্তির বসে', বলেই নীলু অন্য কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যদি খবরটা সত্যি হয় ওরা ওদের ছোট ছোট দল নিয়ে কে কোন দিকে ট্রাম বাস জ্বালাবে তার হিসাব। কে একজন বলে, 'যদি ছুট-ছাট পুলিশ দেখি?' 'ঝেড়ে মালটা কেড়ে নিবি!' অন্য-জনের উত্তর। 'কিন্তু কী করবো সেটা নিয়ে?' 'আরে রেখে দিস কাজে লাগবে! এই শালা রায়-দাস-মুখার্জী-মিত্র চতুর্মুখী দানবটা কলকাতার যুবকদের খুন করতে নেমেছে…' বক্তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে।

সুসী লক্ষ্য করে আজ কেউ ওকে নিয়ে ব্যস্ততা দেখায় না, কেউ-ই ওর দিকে মন দিচ্ছে না। ও যে না-খেয়ে আছে এত বড় খবর শোনার পরেও কেউ-ই কী খাবি বল, বলে সাধছে না! 'ছিঃ, ছিঃ কী লজ্জা! ওকে কী না চেয়ে খেতে হবে? না খাবো-ই না!" ' নিজেকে পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয় সে। ভাবে, 'চলে যাই!' কিন্তু উঠতেও পারে না। একটা উত্তেজনার গন্ধ ওর অবসাদকে গ্রাস করে।

কোন একটা কাগজের একজন ফোটোগ্রাফার সিঁড়ি ভেঙে হলে ঢুকতেই সমস্ত টেবিল থেকে সব বয়সের মানুষ টেবিল ছেড়ে উঠে এসে তাঁকে ঘিরে ধরে। প্রত্যেকেই জানতে চান খবরটা সত্যি কিনা? ফোটোগ্রাফার শুধু কয়েকটা ছবির প্রিণ্ট দেখান। মুখে বলেন, 'ছাপা হবে না।' দর্শক নির্বাক, নির্বাক চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মত ছবিগুলো মাথার ওপরে তুলে ধরে।

প্রথম ছবিটিতে দেখা গেল কয়েকশ' মানুষ রাস্তার ওপরে

বসে আছে। হাতে নানান পোস্টার। সামনে বিশাল পুলিশ কর্ডন। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা গেল কয়েকজন ছেলেমেয়ে বসে থাকা লোকগুলোর সামনে অভিনয় করছে। আশেপাশেও কিছু দর্শক জুটে গেছে, তৃতীয় ছবিতে, পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে···চতুর্থ ছবিতে পুরো অঞ্চলটা ফাঁকা, শুধু কয়েকজন পুলিশ মিলে একজন তরুণকে ডাণ্ডা পেটাচ্ছে, চারদিকে ছড়িয়ে আছে চটি-চপ্পল-ছেঁড়া কাপড়। পঞ্চম এবং শেষ ছবি দেখাচ্ছে···· একজন অফিসর মাটিতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত এক তরুণের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা পা বুকের ওপর একটা গলায়। দেখলে মনে হয় লোহার-নালপরা বুটটা পরে সে মানুষের বুকের ওপর দিয়ে মার্চ-পাস্ট করতেই অভ্যস্ত।

ফোটোগ্রাফার তাঁর ছবিগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে ব্যাগে পুরতে শুরু করে, কয়েক মুহূর্তে গোটা কফি-হাউসটাই থমকে থাকে। হঠাৎ স্লোগান···"নকশালবাড়ি লাল সেলাম! সমস্ত রাজ-বন্দীদের মুক্তি চাই! জেলের তালা ভেঙে রাজবন্দীদের ছিনিয়ে আনো। সিয়াসিবন্দী লোগোঁ ডরো মত! হম্ তোম্হারা সাথ হ্যায়···", বয়স নেই, পেশার ফারাক নেই···অধ্যাপক এবং ছাত্র, শিল্পী এবং পুস্তক-ব্যবসায়ি সকলেই আওয়াজ তুলেছে।

সুসী ভুলে যায় তার খাওয়া হয় নি। সে-ও তার ক্লান্ত, লাঞ্ছিত কন্ঠস্বরকে যথাসম্ভব সপ্তমে তুলে সকলের সঙ্গে স্লোগান দেয়····। রাস্তার ধারে বসে বই বিক্রী করে যারা তাদের মধ্যে কে একজন এসে খবর দেয়, পালাও! ডি-সি-এস-বি মুখার্জী বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে····। কিন্তু তখন আর পালাবার উপায় নেই। কেউ-ই ভাবতে পারে নি এই কফি-হাউসে পুলিশ আসার সাহস পাবে। সরকার এতখানি বোকামি করবে! কী করা হবে সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই, ডি-সি-র চেহারাটা দরজার ওপর দেখা গেল। এক হাতে রিভলভর উঁচিয়ে ডি-সি চিৎকার করে, কেউ নড়বেন না! আমি শুধু একজনকে নিতে এসেছি। এখানে ২৪ ফেব্রুয়ারির জেলভাঙ্গা আসামী প্রভাত সেন আছেন। তাঁকে নিয়েই চলে যাব।' বিক্ষুব্ধ জনতা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। 'এদের মধ্যে কে প্রভাত সেন হতে পারে?' ডি-সি মুখার্জীও

দরজার ওপর দাঁড়িয়েই প্রত্যেকটা মুখকে মাপতে থাকে।

'একজনের দিকে রিভলভরটা তুলে ডি-সি নির্দেশ দেন, 'ঐ যে প্রভাতবাবু! যদি অযথা রক্তপাত না চান সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসুন!' জনতা চমকে তাকিয়ে চাপাগর্জন করে ওঠে, 'ফোটো-গ্রাফার!' ফোটোগ্রাফার ততক্ষণে তার ব্যাগটা বৃদ্ধ শিল্পীর কাছে পাচার করে দিয়েছেন। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে আসে এক মধ্য-বয়স্ক শীর্ণ মানুষ! ডি-সি-র একেবারে মুখোমুখি তার রিভলভর দু'টো মানুষটার মাথার দু-পাশ ছুঁয়ে আছে। একটা চাপা গুঞ্জন, একটা ফোঁস-ফোসানি…'অ্যাই হ্যাণ্ড কাফ লাও!" পেছনের কাকে নির্দেশ দেবার জন্য ডি-সি যেমন-ই সামান্য ঘাড়টা ঘুড়িয়েছে কোথা থেকে সুসী ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডি-সি-র দুই হাতের ওপর। আগ্নেয়-অস্ত্র দু'টো সশব্দে মেঝেতে ছিটকে পড়ে। অভিজ্ঞ ট্রেনিং প্রাপ্ত চীফ হতভম্ব!

কফি পিয়াসীর দল সঙ্গে সঙ্গে এসে হস্টেজ করে ফেলে তাকে, এবার কমান্ড জনতার ··'ফোর্সকে রিট্রিট করতে বলুন!' ডি-সি, মুখার্জির মুখ থেকে কথা সরছে না। এতক্ষন ধরে যে মুখটা দিয়ে অনবরত নির্দেশ, আদেশ, ব্যঙ্গের ফোয়ারা ছুটছিল সেটাতে কোনো এক অদৃশ্য সাপুড়ে ধুলো পড়া দিয়ে দিয়েছে যেন। মুখ মণ্ডল থেকে কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। থর থর করে কাঁপছে সে। 'শালা! কাওয়ার্ড! লালবাজারে, লর্ড সিন্‌হাতে কেলাবার অর্ডার দেবার সময় এই কাঁপুনি কোথায় থাকে?' জনতার একজন টিপ্পনী কাটে। 'সরোজ দত্তকে গুলি করার সময় হাত তো টার্গেট মিস করে নি!!'—আর একজন বলে। থর থর কেঁপে ওঠে দুর্দান্ত পুলিস অফিসারের ঠোঁট…

মিছিল করে এগিয়ে যায় কফি পিয়াসীর দল। সামনে ঢালের মত ধরে আছে মিঃ মুখার্জিকে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ফোর্স তাদের অফিসারের দিকে চোখ রেখে 'ব্যাকওয়ার্ড—মার্চ" করতে থাকে। উল্টোদিকে মুখ করে নামতে গিয়ে কেউ বা দেওয়ালে ধাক্কা খায়, কেউ পড়ে হাঁটু ভেঙে! 'বস্তিল ভাঙছে', কে যেন বলে ওঠে!…

আট

ডালহাউসি স্কোয়ারের লাল বাড়িটার একটা ঘরে ছুটে আসে মন্ত্রীসভার সদস্যরা। প্রেস কর্ণারের সাংবাদিকরা ভাবে ব্যাপার কী? মুখ্যমন্ত্রী তখন সবেমাত্র চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ সেরে কফিতে চুমুক দিয়েছেন···সবে-মাত্র পরামর্শ করে নিজের পার্টির বিক্ষুব্ধদের, বিশেষ করে তথ্যমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎমন্ত্রীকে কী করে কোণঠাসা করা যায় সেটা চক্-আউট করেছেন। কাকে কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, কাকেই বা একেবারে গুম করা যায় সেই তালিকা প্রস্তুতে এতক্ষণ হিমসিম খেয়ে সবেমাত্র তিনি রিল্যাক্স করতে শুরু করেছেন···

সবকটা হটলাইন একই সঙ্গে বেজে উঠল, কণ্ট্রোল থেকে নির্দেশ চাওয়া হচ্ছে, 'কী করা হবে!' বাক্‌রুদ্ধ ব্যারিস্টার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নীলরঙের স্পোর্টস গেঞ্জি এয়ার কণ্ডিশন থাকা সত্ত্বেও ঘামে ভিজে উঠলো, 'হোয়াট !···এও সম্ভব···বোকার মত যায় কেন !··· কমিশনার নিজে গেছে···

কার্জন পার্কে ছেলেটা মরলো কী করে ?···দিস্ ইজ্ পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল সাবোটেজ !···মুক্তি চাই !! কাদের ? নক্‌শালদের !! সি-পি-এম-তো বলেছে ওরা গুণ্ডা···এখন অন্য কথা বলছে···হুম্ ···এখন সকলেই সাধু !···"

অন্য একটা ফোনে নির্দেশ দেন, 'কলেজস্ট্রিট ফাঁকা ! আপনি কলেজস্ট্রিট এবং আশপাশ কম্বিং করুন···উড়িয়ে দেন কফি হাউস ! মেয়েটাকে চাই ! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই···' তৃতীয় ফোনে কাকে যেন ধমক দেন, 'প্রফুল্লদা রাজি হলেন না ! শালা বুড়ো··· সোয়াইন ! না বন্দীমুক্তি হবে না' চতুর্থ ফোনটা ধরেই আর্তনাদ করে ওঠেন, এটা কর্ডলেস ওর ব্যক্তিগত গোপন ফোন, 'আর ইউ সিওর ম্যাডাম !···তা হলে · আচ্ছা ম্যাডাম···' দিল্লীর নির্দেশ··· ফোন নামিয়ে রেখে হাঁ করে কিছুক্ষণ সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন, কী সুন্দর ম্যাচিঙ্ রঙ ! খেয়াল নেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, পি-এ, সি-এ সব মিলিয়ে একডজন মেয়ে-মদ্দ । হঠাৎ চোখ নামিয়ে চিফ সেক্রেটারিকে নির্দেশ দেন 'কেউ স্টেশন লিভ করবেন

না !' হাঁফাতে থাকেন খেলোয়াড় মন্ত্রী ! একটা ফোনেই মনে হল তাঁর বয়স দুগুণ বেড়ে গেছে…এক পি-এ-কে গলা নামিয়ে নির্দেশ দেন, 'মন্ত্রীদের সকলকে আমার ঘরে আসতে বলুন। ঘর ফাঁকা করে দিন !' 'প্রেসকে কী বলবো স্যার !' চীফ সেক্রেটারি জিজ্ঞাসা করে। 'বলুন ! দুষ্কৃতকারিদের আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ধরে ফেলবো ! আইন চলবে আইনের পথে…কার্জন পার্কে কতকগুলো সমাজবিরোধি পুলিশকে আক্রমণ করে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে লাঠি চালালে….কেউই হতাহত হয়নি। যে তরুণ মারা গেছে তার অন্য রোগ ছিলো…খুব বেশী ভাত খাবার জন্য নালি দিয়ে ভাত উঠে লাঙে ঢুকে সে মারা গেছে….' চীফ-সেক্রেটারি থমকে যায়, 'কী বলছেন স্যার !'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছি তাই…এই রকম একটা যুক্তি দিয়ে আমি সুপ্রীম কোর্ট থেকে পল্টনকে বার করে আনলাম, বাঘা বাঘা জজরা যেখানে কনভিন্স হয়ে যায় জনসাধারণ হবে না কেন ?…'

ঠোঁট-কাটা চিফ্-সেক্রটারির জিবের ডগায় এসে গিয়েছিল বলে 'কততে রফা হয়েছিল স্যার !' বড় জোর সামলে নিয়েছেন।

মন্ত্রীরা ছুটতে ছুটতে ঢোকে চীফের ঘরে…পুলিশ কমিশনর, আই-জি, জরুরী তলব পেয়ে ছুটে আসে, বাইরের লাল আলোটা জ্বলতে থাকে। সংক্ষিপ্ত সভা, একজনই বক্তা, একজনের সিদ্ধান্তই শেষ কথা ! মুখ্যমন্ত্রী ব্রিফ করেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লী থেকে হাইকমাণ্ড জানিয়েছেন কেন্দ্রের নতুন সরকার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রীসভা খারিজ করে দেবে।…সমস্ত ফাইল ঠিক করে ফেলতে হবে…বিশেষ করে পুলিশ ফাইল…রাতদিন খেটে সকলকে চলে যেতে হবে যে-যার নির্বাচনী এলাকায়…। এক তরুণ মন্ত্রী বলে ওঠে, 'যাবার আগে আপনি রাজবন্দীদের মুক্তি ঘোষণা করে যান ! না হলে আমরা এলাকায় থাকতে পারছি না…'

কমিশনার জানান, 'গোটা কলকাতা জ্বলছে, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে, এমন একটা রাস্তা নেই যেখানে পুলিশ-মিলিটারি ঢুকতে পারে…নতুন-কেন্দ্র যথেষ্ট সাহায্য করা সত্ত্বেও আমরা ইস্যুটাকে আর ঠেকাতে পারছি না !'

'কনাফ-কী বলে ?'

'প্রফুল্ল সেনকে ধরা হয়েছে, লোক লেগে আছে…কিন্তু ম্যাস সেণ্টিমেণ্ট ঘুরে গেছে…রাজবন্দীদের প্রশ্নে যে-পার্টি নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ড নেবে…বাজার তার…'

'হুম !' কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে নিজের এক সহকর্মিকে বলেন, 'কী যুব-নেতা ! চার 'ম' হেরে যাবে ! মানু-মুখার্জি-মিত্তির-মুন্সী হেরে যাবে !' যুব নেতা অর্থাৎ মুখার্জি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'পুলিশ দপ্তরটা আরও কেড়ে নেন আমার কাছ থেকে ! আপনিই ডুবিয়েছেন ! ওই ভদ্রলোক, কমিশনর আর আপনি… । আমি ওসবের মধ্যে নেই…কাল-ই দিল্লী যাব…' ।

'স্যারকে এসব বলার তুমি কে ? ছাত্রপরিষদকে প্রদেশ কংগ্রেসের বিকল্প করে তুমিই তো প্রথমে খুনোখুনি শুরু করলে…'

বিক্ষুব্দ বিদ্যুৎ মন্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলো ।

ঝগড়া-ঝাঁটি, তর্ক-বিতর্কের মধ্যে মন্ত্রীসভার মিটিং শেষ। কমিশনার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, মন্ত্রীরা চলে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব খবরের যন্ত্রটা চালু করে এক দৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন, 'নতুন কেন্দ্রীয় সরকার বহু হত্যা এবং দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। 'মুক্তি-সূর্য পাঞ্জাবে খালিস্তানীদের সঙ্গে আলাপ চালাচ্ছেন', 'আসামে বিদেশী খেদাও আন্দোলন তীব্রতা লাভ করেছে…' এই দুটো খবরের মুখ্যমন্ত্রীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিড় বিড় করে বলেন, 'ছোকরার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। কেমন লাগিয়ে দিলো !' সামলাও তো বাবা চরণ সিং, তখনও পুলিশ কমিশনার ঘর ছেড়ে বেরোয় নি, তিনি বলেন, 'স্যার ! মাননীয় তথ্য মন্ত্রী এবং মিত্রবাবু আপনার বিরুদ্ধে কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন এই মাত্র !'

'আমরা তো আসলে পিঁপড়ে, এতদিন ক্ষমতার চিটেগুড়ে আঁটকে এক ছিলাম। ক্ষমতা থাকবে না বুঝেই ছিটকে পড়ছি… । ওই মহিলা সর্বনাশের মূল ! গণতন্ত্রের মিনিমাম ডেকোরাম মানবেন না…আমিও…'

'কিন্তু স্যার ভুলে যাবেন না, এমার্জেন্সীর ড্রাফট্ আপনার

করা। এই গোটা সময়ে আপনিই ওঁদের মা-বেটার প্রধান তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন···আর তা ছাড়া এত হতাশ হবার কী আছে? কোনরকমে তিরিশটা আসনে জিততে পারলে···প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে কথা বলাই আছে অজয় মুখার্জির মত ব্যাক-কিক্···আপনি শুধু 'উপ' হয়ে যাবেন তখন।'

কমিশনারের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, 'ওদের আসন ভাগাভাগির কী হল?' 'প্রফুল্ল সেন জিদ ধরে বসে আছেন সিক্সটি পারসেন্ট আসন তাঁর চায়!' কমিশনার উত্তর দেন। 'হুম এই রকম-ই তো কথা। আসলে উনি তো আমাদেরই লোক!'

'সে আর বলতে স্যার! এই যে ফাইল-গায়েব করার জন্য ৭২ ঘণ্টা সময় দিলো আপনাকে··'

'কী, কী বললেন!'

কমিশনর চুপ করে থেকে বলেন, 'স্যার! মিনিস্টার মে কাম অ্যাণ্ড মিনিস্টার মে গো···কিন্তু আমরা আছি স্যার! থাকবো ···আপনার গাড়ি রেডি···আমি চললাম আলিমুদ্দিনে ডিউটি চেক করতে!'

কমিশনর স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোনটা দিতে বললেন···। কলকাতা ঠাণ্ডা করার জন্য নতুন জনতা সরকার ছ' ডিভিশন ই-এফ-আর পাঠাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্টভাবেই বললেন, 'বন্দীমুক্তি ঢালাও হবে না! বেছে বেছে জেলে জেলে তিনি বণ্ড পেপার পাঠিয়েছেন····'

মুখ্যমন্ত্রী হাঁসেন। ম্লান হাসি। নকশালদের নেতারা বণ্ড পেপারে সই করতে চাইলেও···কর্মিরা চাইছেন না···এ খবর তাঁর আছে। সাপের ছুঁচো গেলা···কী যে তিনি করেন এই বন্দীদের নিয়ে···ভাবতে ভাবতেই গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভার ড্রেস খুলে ফেলেছে। সাধারণ পুলিশ ভ্যান নেই। আটটা এ্যাম্বাসাডারে সিভিল-পোষাকের পুলিশ! চমকে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী, 'ইউনিফরম কোথায়?' এসকর্টের চার্জে থাকা এ-সি বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'স্যার ইউনিফরম পরে রাস্তায় বেরুনো যাচ্ছে না! কলকাতা জ্বলছে। সর্বত্র গুলি-গালা আর পেটো চলছে। গাড়ি

অ্যাটাকড্ হয়ে যাবে!' 'হুম' বলে তিনি নিজের বিলাসি গাড়িটাতে উঠলেন।

গাড়ি চলছে প্রকাণ্ড রাজপথ ধরে। রেসকোর্সের পাশে এসে একবার তিনি ফাঁকা আবছা রেসের ময়দানটা দেখে নিলেন। এবারে তাঁর বাজি 'কুইন' কি জিততে পারবে? গাড়ি ঢোকে অপেক্ষাকৃত সরু পথ হরিশ মুখার্জি রোডে বড় রাস্তাতে বাস জ্বলছে···তাঁর তৈরি করা নতুন ধরণের টর্চার-চেম্বার এস-এস কে-এম হাসপাতাল····একবার আবার তাকালেন তিনি···হাসপাতালকে থানাতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে হিটলারের পরেই তাঁর নাম ···হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো হাসপাতালের গায়েই বড় বড় করে লেখা আছে···'সমস্ত রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই! রাজবন্দীদের জেল ভেঙে মুক্ত করবোই করবো।' চিৎকার করে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সঙ্গের নিরাপত্তা কর্মি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ইশারায় তিনি নিরাপত্তা কর্মিকে চলতে বলেন···মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে····একটাই শব্দ ··'রাজবন্দী! রাজবন্দী!' দূরে কোথাও পেটোবাজি হচ্ছে, বাতাসে বারুদের সেই গন্ধ ভেসে আসছে···সেই শব্দে একটাই ধ্বনি 'রাজবন্দী···' মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে চলেছেন তাঁর ঘরের দিকে

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নেই বিধান রায় ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিলেন। একজন ট্রাম কর্মীর কাছে হারতে বসেছিলেন···· মুখ্যমন্ত্রী তখন ছিলেন বিরোধী ক্যাম্পের লোক···তারপর থাক সে কথা! কী যেন একটা পারিবারিক কেলেংকারী চাপা দেবার জন্য তিনি বিধান রায়ের সঙ্গে যোগ দেন···। এই রাজবন্দীদের প্রশ্নেই প্রফুল্ল সেন ডুবেছেন···এই রাজবন্দীর প্রশ্ন তাঁর সাধের কলকাতা থেকে তাঁকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে····

'ন্না, প্রফুল্লদা পারবেন না! সি-পি-এম জিতে যাবে শুধু এই একটাই প্রশ্নে···'। 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই····'। এটাই ওদের জিতিয়ে দেবে। কয়েক হাজার মানুষকে মুক্ত করার জন্য কয়েক লক্ষ মানুষ জেলে যেতে প্রস্তুত! অদ্ভুত দেশ! একটা বাচ্চা মেয়ে অভিজ্ঞ টপ-পুলিশ অফিসারকে বোকা বানিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল একজন জেলভাঙা আসামীকে··· !'

'রাজবন্দীদের যারা বন্দী করে, আসলে তারা নিজেরাই বন্দী হয়ে যায়'—পশ্চিমবঙ্গের হাতে-মাথা-কাটা মুখ্যমন্ত্রী স্বগতোক্তি করলেন। সময় ছিলো যখন তিনি গাছের ফুল ছেঁড়ার মত মানুষের মুণ্ডুটা কেটে নিজের ড্রয়িংরুম সাজাতে পারতেন…সেই সব মুখ! আজ নিজের মুণ্ডুটা বাঁচাবার জন্য ধর্ণা দিতে হবে। নিরাপত্তার জন্য….এক অবসাদে গাড়ির সোফাতেই এলিয়ে পড়েন তিনি…গাড়ি ঢোকে তাঁর বাড়িতে । নড়ে চড়ে বসতেই আবার সেই চিন্তা…'রাজবন্দী! মুণ্ডহীন ধড়গুলো তাঁর চোখের সামনে নাচতে থাকে ‥ ' অবসন্ন মুখ্যমন্ত্রীকে ধরাধরি করে নামান তাঁর নিরাপত্তাবাহিনী! মুখ-টিপে হাসাহাসি করে নিরাপত্তা কর্মীরা, 'গাড়িতে বসেই শালা কী পরিমাণ গিলেছে দেখ!' · মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন, 'উত্তেজনা চাই! আরও উত্তেজনা! খুন, গুম, ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আছে বৈচিত্র!' সুসীও ভাবে, 'প্রভাত-কে বিয়ে করে কী হলো? বৈচিত্র কোথায়? রিক্রিয়েশন! সম্পূর্ণ ভাবে রাউণ্ড দ্য ক্লক প্রেম! প্রভাতকেও ভাগ করে দিতে হয়…অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য‥ছ্যাঃ এটা জীবন! নতুন ছেলে চাই!' চাষী বউ পাশে শুয়ে থাকা শীর্ণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, 'একটু শান্তি চাই! একটু স্থায়িত্ব…একটু স্বস্তি…আর ভাবতে পারছি না…'!

আজও সেই ট্র্যাডিশন ·

'আপনি মুক্ত! পুলিশ সব ওঠে গেছে…' কয়েকটা ক্যামেরার ফ্লাশের সঙ্গে কথাগুলো কানে এল। তাকিয়ে দেখি সংবাদ জগতের লোকেরা ছোট হাসপাতাল কেবিনটাতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে…'কি ভাবছিলেন এতক্ষণ?'‥কে একজন প্রশ্ন করেন,… 'আপনি কি আগে খবর পেয়েছিলেন'—আর একজনের প্রশ্ন…' C P (M) যদি অফার দেয় নেবেন?'….তৃতীয় কণ্ঠস্বর….। 'কী করবেন বাইরে বেরিয়ে …' ….চতুর্থ জন মহিলা…

সব প্রশ্নের উত্তরে হাসি দিয়ে জানালাম,…আ 'পেসেণ্ট ইথারাইজ্‌ড্‌ আপন আ টেবিল!…সেসেস্কুর কী হল বলুন তো? এই চেতনহীন অবস্থা থেকে রুগী কি বেরিয়ে আসবে?….'

তারপর দিন যায় মাস যায়…বছরও ঘুরে গেল…এক অদ্ভুত বন্দীত্ব।

'তুমি যা চাও, সেটা যত মিথ্যা চাওয়াই হোক, যত অবাস্তবই হোক, সেটাকে যদি চকচকে কথার ঝকঝকে বাক্যজালে বেঁধে মানুষের মধ্যে অডিও ভিস্যুয়াল এফেক্ট তৈরি করতে পারো সাময়িকভাবে হলেও তার প্রতিরোধ ভেঙে যাবে।···তোমার চাওয়াতেই সে শর্তাধীন হয়ে তোমার ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র হয়ে যাবে··· ।'

আধুনিক প্রচার বিজ্ঞানের তো এটাই মূল কথা। শিল্পী তাঁর ছবি আঁকেন এটাকেই মাথায় রেখে, সাহিত্যিক লেখেন এটা লঙ্ঘন না করে। পরিচালক ভাবেন, 'কী করে বাজার পাবো এই অডিও-ভিস্যুয়াল এফেক্ট তৈরি না করে !'

এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোও দল বাড়াতে এই নীতিকেই প্রয়োগ করেন। তাহলে গোয়েবলস কি ভুল বলেছিলো শুনি ! বেচারা মাথামোটা। বলা কথাটার সূত্রায়ন করতে পারেনি। 'সত্য', 'মিথ্যা' এইসব হাবি-জাবি বলতে গিয়েই যত গোল পাকিয়ে ফেলেছে···'একটা মিথ্যাকে জোর গলায় বারবার প্রচার করো, প্রথম দিকে একটু কিন্তু কিন্তু করলেও, আস্তে আস্তে মানুষের প্রতিরোধ কমে আসবে—তারপর সেটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করবে ···' হিটলারটা না হেরে গেলে, আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য রাজনীতির মুখ্য তাত্ত্বিক হতো গোয়েবলস···

সারাদিন পাবলিশার্সের ঘুপচিতে বসে কমা, দাঁড়ি, আর পয়েন্ট মিলিয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে দেখি ধুন্ধুমার কাণ্ড···

'ফিরোজা বলে কিনা এই রঙ দিয়েছে ! এই নাও ক্যাশমেমো, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে এসো···'

বুঝলাম 'নিওনের' উজ্জ্বল কারসাজির শিকার হয়েছেন উনি। বললাম···'জৌলুসে মোহগ্রস্ত হলে ঠকতে হবেই। আমার কিছুই করার নেই।' স্বয়ং গোর্কি'ই যেখানে সারাজীবন আমেরিকা-দর্শনের খেদ ভুলতে পারেননি, আমি তো কোন ছার !

'চিরকাল জানতাম আলো সত্যের প্রতীক, সাদামাটা সত্য

(বেয়ার থ্রুথ) বোঝাতেই শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিকরা আলো কথাটা ব্যবহার করেছেন। এদেশে এসে বুঝলাম এখানে আলোও পকেট কাটে····হাতছানি দেয়····লোক ঠকায়···· ।'

এসপ্ল্যানেড পার্কস্ট্রিট অঞ্চলে সন্ধ্যের পর ঘুরে এসে কোন সাত্ত্বিক হিন্দু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো তিনি প্রার্থনা করতে পারবেন···'ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়···আমি নিশ্চিত, পারবেন না। কোন 'জ্যোতি'--তে যাবেন তিনি! এখানে 'জ্যোতি' যে ব্যাভিচারে লিপ্ত, হাতছানি দিয়ে লোক ডাকে সর্বস্বান্ত করার জন্য, —'ভিস্যুয়াল এফেক্ট' তৈরির উপাদান মাত্র····একটা পণ্য···· টিনের সেপাই····

উজ্জ্বলা এখন নারীমুক্তি করছে

উজ্জ্বলা আর সত্য। আমাদের কাছে ওরা ছিল আদর্শ দম্পতি। ওদের দেখতাম আর ভাবতাম 'একেই বলে মেড ফর ইচ আদার····' ঝকঝকে চির-আমুদে উজ্জ্বলা দার্শনিক-টাইপ সত্যকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে আমরা একটু অবাকই হয়েছিলাম। পরে মনে হলো, 'আমরা সবাই ভুল।'

দুঃখ-দারিদ্র্য আর প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে গেল সে।

একটা দেড় বছরের আর একটা দু-মাসের বাচ্চাকে ফেলে রেখে সত্য চলে গেল বিদেশে। সেখানে আট-ন'বছর কাটিয়ে আরও শত্রু তৈরি করে ফিরে এলো ঘরে। ইতিমধ্যে তার নাম-খ্যাতি ছড়িয়েছে অনেক, সাহিত্য-দর্শনে একটা বিশেষ ধারার একক প্রতিনিধি। তার লেখার চেয়েও লোকে তাকে ভালোবাসে তার জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখে, সত্যি কথা বলার সাহস দেখে, আর প্রলোভন জয়ের সংগ্রাম দেখে। মাথা-মুখ-হাতের মধ্যে কোন ফারাক নেই তার। যা ভাবে তাই বলে। আর যেটা বলে সেটা করে দেখাবার চেষ্টা করে।

কেউ বলে 'জিনিয়াস', কেউ বলে 'বোকা'। তবে যে যাই বলুক না কেন, শত্রু, মিত্র প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা করে। এগুলো সবই তাকে এনে দিল গৌরব। এই গৌরবের ভাগীদার হলো—উজ্জ্বলা!

এবং বাচ্চা দুটোও।

গৌরব মানুষ ডেকে আনে। অডিও-ভিস্যুয়াল এফেক্ট। নানান ধরনের মানুষ আসতে থাকে ওদের ফ্ল্যাটে। একটাই ঘর। যেটাকে দুটো করে নিয়ে বড় ঘরটা উজ্জ্বলাদের ছেড়ে দেয় সত্য। নিজে থাকে ছোট ঘুপচিটার মধ্যে।

এতদিন পরে এত মানুষ দেখে সত্য ঘাবড়ে যায়। বিমর্ষ হয়ে পড়ে। ওদের কথা শোনে। মনমত না হলে তুমুল তর্ক করে। বিগড়ে যায় কত বন্ধু। আসলে ব্রাত্য সে। তর্ক সে করে বিরুদ্ধ একজনের সঙ্গে বটে, কিন্তু আসলে তর্কটা সে করে নিজের বিরুদ্ধেই। 'কখনও যদি পা হড়কে পড়ে যাই। এই কথাগুলোই আমাকে টেনে তুলবে'—সে বলতো। ওদের পরিবারের ওপর থেকে এতদিনের লৌহ যবনিকা উঠে গেল....।

উজ্জ্বলা আবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেল। ডবল প্রতিষ্ঠা—এক, তার এতদিনের একক সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসাবে। দুই, সত্যের গৌরবের অংশীদার হিসাবে। এখানে সেখানে নেমন্তন্ন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে যাতায়াত শুরু হলো...।

তার চারপাশে জুটলো উচ্চবিত্ত বাড়ির মহিলারা। স্বামী-শ্বশুরের কালো টাকার শ্রাদ্ধ করা, এবং ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে টেনশনের প্রিটেনশন ছাড়া যাদের আর অন্য কোন কাজ নেই জুটলো তারা। দূরে সরে গেল দুর্দিনের সাথীরা।

জুটলো অমৃত বলে অভিজাত পরিবারের একটা ছেলে। খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। সত্যের প্রাক্তন ছাত্র। বাচ্চাগুলোও অমৃত মামা বলতে পাগল। সে ওদের খেলনা এনে দেয়। রেস্টুরেন্টে খাওয়ায়। মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে নিয়ে যায়। সত্যজিৎ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্ত বইছে নাকি ওর ধমনীতে। ব্লু ব্লাড!

এ-কথা শোনার পর সত্য একদিন ওকে ধরলো, 'তাহলে তুমি ব্লু ব্লাড! তা রক্ত কখন নীল হয় জানো?··আমাদের দেশের প্রবাদে বলে সাপের কামড়ে বিষাক্ত হলে কিংবা রাবণ-রোগ (ভি-ডি) হলে!' সকলে হেসে ওঠে। অমৃতও ফ্যাকাসে হাসি হাসে।

অমৃত ঢুকলো। বেরিয়ে গেল আসল লোকগুলো। সত্য

উজ্জ্বলাকে বলে, 'কি অমৃত এসে সব গরল দূর করলো না কি!' 'আমাদের দুর্দিনের বন্ধুরা কিন্তু ওকে দেখে একে একে চলে যাচ্ছে। ভাত-ডালে-ই তো বেশ ছিলাম। অমৃতে কি দরকার বুঝি না ?...'

একদিন অমৃত তর্ক জুড়ে দেয়, 'স্যার ম্যান ক্যাননট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন!...' সত্য ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'পেটটা ভরা থাকলেই ওটা বলা যায়। বুঝলে ব্রাদার!...'

এঁদের তো একটা জীবন আছে স্যার। একটু পরিবর্তন! একটা সংসারের জন্য একটা মেয়ে মরে যাবে...'

সত্য ক্ষেপে যায়, 'দেখ অমৃত! মানুষের ঘরকে যদি মৌচাক বানাতে চাও পৃথক প্রশ্ন। তা হলেই খাটাখাটনির হিসেব-নিকেশ আসে। একজন রানী থাকবেন অলসভাবে বসে। বাকিরা তাঁর হুকুম তামিল করবেন—এটা কোন যুক্তি নয়। সসম্মানে বাঁচতে গেলে খাটতে তো হবেই।...

'আমি স্যার ওদের একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে চাই। হাজারি-বাগে আমাদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে যাবো...' একটু চমকে সত্য, অমৃত এবং উজ্জ্বলার দিকে তাকালো, তারপর গলা নামিয়ে বললো, 'তা যেতে চায় ওরা যাবে।'

ওরা চলে গেল। সত্য ভাবতে বসে। 'মুক্ত দুয়ার' তার বিষ ছড়াচ্ছে। উজ্জ্বলা ভেসে যাচ্ছে, রক্তে বয়ে আনা সাংস্কৃতিরআর জীবন-দর্শনের স্রোতে। ভেসে যাচ্ছে দু'টো বাচ্চা। যাদের রক্ত এখনও দূষিত নয়, এরকম দু'টো বাচ্চা ভেসে যাচ্ছে। স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বিড় বিড় করে, কলম চেবায়, চুল ছেঁড়ে।...'বাঁচাতে হবে। ঐ দুটো অসম্ভব ট্যালেন্টেড মানব শিশুকে বাঁচাতে হবে!' হায় সত্য বড্ড দেরি হয়ে গেছে! শুধু নিরস বই দিয়ে বাচ্চাদের জয় করা যায় না। তুমি এত জানো, এটুকু জানো না, "বাচ্চাদের আনন্দ পাওয়াটা সম্পূর্ণ 'সেন্সুয়াল প্লেজার'।" আর সেখানে নৈতিবাচক দৃষ্টান্ত তাড়াতাড়ি কার্যকরী হয়। এটাতে যখন ঢুকতে দিয়েছো, কিছুই করার নেই। তুমি যখন বলছো, 'পড়ো! হান্স অ্যান্ডারসন পড়ো!' আর একজন তখন ওদের নিয়ে চলেছেন এলিজাবেথ টেলরের রেট্রোসপেক্টিভ দেখতে। তুমি যখন 'জ্যামিতির

রহস্য বোঝাচ্ছো, আর একজন হাত পা ছুঁড়ে ফন্টা আর জ্যাকসন গাইছেন!'

সত্য গুন গুন করে, 'এ কেবল দিন ও রাত্রে/জল ঢেলে ফুটো-পাত্রে/বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবারে…'

তুমি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সত্য। এখন একটা নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা তুমি। পর্বতপ্রমান ঢেউগুলো এসে তোমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। পারবে তো একটা লাঠিতে ভর করে তাদের ঠেকাতে!

ওরা ফিরে এলো। আরও উদ্দাম। ঘরে সবসময়েই স্মৃতি রোমন্থন। জ্যাকসন, ফণ্টা, চাইনীজ খাবারের রেসিপিতে কথা আর আলোচনা সীমাবদ্ধ। নরক গুলজার।

সত্য ভাবে, 'বাধা দেবো? জোর খাটাবো?' সিদ্ধান্ত নেয়—'না। এতদিন এই পচাগলা ব্যাপারগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেও যদি উজ্জ্বলা নিজেকে না পাল্টাতে পারে জাহান্নামে যাক সে। আর যে জাহান্নামে যেতে চায় তার জন্য পারলে রাস্তাটা পরিষ্কার করে দাও। মানুষগুলো মোহমুক্ত হবে।'

তবুও একটা বুকচেরা নিঃশ্বাস বার বার ডেকে ফেরে… 'উজ্জ্বলা ফিরে এসো! নরকের রাস্তা চিরকাল চটকদারই হয়ে থাকে।' ওর দেওয়ালে টাঙানো গের্নিকাতে আলো পড়ে। ঐ ঘোড়াটা আবার বেঁচে উঠেছে। এবারও উজ্জ্বলাদের পায়ের তলায় ফেলে মারছে। কিন্তু বাচ্চা দুটো? ওরাও ভেসে যাবে। ওরাও ঐ দানবীয় ঘোড়ার তলায় পিষ্ট হবে?'

অমৃতের সামনেই উজ্জ্বলার হাতে দুটো চেপে ধরে, 'উজ্জ্বলা ওদের ফেরত দাও! তুমি যাচ্ছো যাও!' চিৎকার করে। ধমকায়।

উজ্জ্বলাও ফুঁসে ওঠে, 'হুম বাচ্চা ফলাতে এসেছেন উনি! অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন? কাগজে নাম ফাটাতেই তো ব্যস্ত ছিলেন! নচ্ছার লোক একটা!'

অমৃত হাসে। 'জানিস! এই মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন উনি!'

অমৃত চমকে ওঠার ভান করে। বাচ্চা মেয়েটা ভয়-ভয় চোখে বাবাকে দেখে আরও দূরে সরে বসে। সত্য হতভম্ব! চিরতার্কিক সত্য প্রতিবাদের ভাষা পাচ্ছে না। আত্মপক্ষ সমর্থন? ছিঃ! ঘর

ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় শুধু বললো—'ছেলে-মেয়ে দু'টোকে মেরে ফেললেই ভালো হ'তো! কারণ শ্রীরাধিকেরা যশোদা হন না। ম্যাডোনা-সৃষ্টি হয় না তাদের দিয়ে…,'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও! এ-ঘর আমার! আমি যা খুশি করবো! বাচ্চা? বাচ্চাদের জন্য ভারি তো কনট্রিবিউশন! কিছুক্ষণ শোয়া!' বাচ্চাদের সামনেই ইতরামো ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। উজ্জ্বলা তখনও বকে চলেছে · 'এদের ভবিষ্যৎ কি বলো? কাল যদি তোমার টাকা কাগজওয়ালারা বন্ধ করে দেয় এরা কি খাবে?'

অমৃত অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। হাজার হোক স্যারের প্রিয় ছাত্রদের একজন ছিলো সে। স্যারের নামে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়েই এখানে ঢুকেছে। ওকে দেখে প্রথমদিন উজ্জ্বলা বলেছিলো, 'অত্যন্ত ধান্দাবাজ ছেলে! শ্র্যুড!'

'জিন্দাবাদ', 'জিন্দাবাদ' করতে করতেই ও উজ্জ্বলার প্রতিরোধ ভেঙেছে।

এরপর মাঝে মধ্যেই অমৃত রাতে থাকতে শুরু করলো। সত্য নিজের ঘরটা ওকে ছেড়ে দিতো। যেদিন অমৃত থাকতো উজ্জ্বলা প্রায় ভোর রাত পর্যন্ত অমৃতের ঘরে গল্প করে কাটিয়ে আসতো। সত্য বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে পড়ে থাকতো এ ঘরে। ওদের কথা-ঝর্তার টুকরো কানে আসতো।

'মায়ের কাছ থেকে হাজারিবাগের বাড়িটা বাগাতে হবে। ওটা বাচ্চা দু'টোর নামে লিখে দেবো…' অমৃতের গলা। ঘেন্নায় গা রি রি করে! সত্য হাঁক দেয়, 'উজ্জ্বলা! একটু চুপ করো!'

ফুঁসতে ফুঁসতে এ ঘরে ঢোকে সে। 'ছোটোলোক, ইতর! আমি কি ওখানে প্রেম করছিলাম?'

উজ্জ্বলার চেঁচামেচিতে বাচ্চা দু'টো জেগে যায়, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। নিচের গেটটা খুলে সামনের ফাঁকা জমিটাতে পায়চারি করতে থাকে। শেষ রাতের বাতাস তার শরীর ঠাণ্ডা করে, কিন্তু মাথায় আগুন জ্বলে। একই পথে সে একবার এগোয়, একবার পেছোয়। কারণ সামনে আর পথ নেই। সারি সারি বাড়ি পথ আগলে দাঁড়িয়ে, পেছনেও যাবার রাস্তা নেই…। মাদার ডেয়ারির একটা বুথ পেছনের পথটাও আটকে

দিয়েছে…।

দুধের গাড়ি এসে দুধ নামিয়ে দিয়ে যায়। আর কিছুক্ষণ পরেই একটু সাদা জলের জন্য একে একে লোক এসে জমায়েত হবে। ছ'আনা, আট আনা পয়সার বিনিময়ে (তিরিশ এবং পঞ্চাশ পয়সা) কলোনির বাচ্চাগুলো এসে লাইন দেবে। মধ্যবিত্ত বাবুদের কেউ কেউ এবং চা, মিষ্টির দোকানদাররা ধীরে সুস্থে আসবেন…

হাঁটতে হাঁটতে একটা ক্লান্তি বোধ করে সে। আস্তে আস্তে ফিরে যায় নিজের ফ্ল্যাটের দিকে। ঘরের দরজা খুলেই শোনে উজ্জ্বলা চেঁচাচ্ছে, 'এটা একটা নরক !…বিড়বিড় করে সত্য জিজ্ঞাসা করে—'কে করলো ?' 'এখানে একটা গানও গাওয়া যায় না।'…উজ্জ্বলা চিৎকার করে।…'শোবার এবং পড়ার ঘর তো আর ক্যাসেটের দোকান নয়….'

'….একটা আতঙ্ক !'

'…সত্যিই তাই !'

'…সত্যিই তাই !'

সত্য নিজের ঘরটাতে গিয়ে পড়ে। সাড়ে আটটা বছরের ত্যাগ, দুর্ভোগ সব মিথ্যা ! পাঁচ হাজার বছরের বিকৃতির সঙ্গে লড়ছে সাড়ে আট বছর !

অমৃত ও ঘরে। উজ্জ্বলাকে সে পরামর্শ দেয়….'স্যার আসলে ফিউডাল মেণ্টালিটির লোক।' এর বিরুদ্ধে তোর রুখে দাঁড়ানো দরকার'…সত্য বুঝতে পারে শর্তাধীন হচ্ছে উজ্জ্বলা।

পরের দিনও অমৃত থেকে গেল। সারাদিন কেমন গুমোট ! সন্ধ্যে থেকে ছেলেটা বায়না ধরলো ওরা অমৃত মামাকে নিয়ে বড় ঘরে শোবে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সত্য।

ওরা চারজনে বড় ঘরে। খাটটার ওপরে উজ্জ্বলা আর মেয়েটা। নিচে অমৃত এবং খোকা। নিজের ঘরে বসে সত্য লিখে চলেছে… একটা মেয়ের আত্মত্যাগের কাহিনী। ভোর হয়ে আসছে। ও ঘর থেকে আজ কোনো কথা ভেসে আসছে না। মেয়েটা বোধহয় জেগেছে।

সত্য আস্তে আস্তে এ ঘরে ঢুকলো। খুকী খাট থেকে নেমে

কী একটা নিয়ে খেলা করছে। শাড়ির খরচ কমানোর জন্য (উজ্জ্বলা তাই বলে) উজ্জ্বলা ইদানীং, শোবার আগে ম্যাক্সি পরে নেয়। খাটের দিকে তাকিয়ে দেখে ওর ম্যাক্সিটা কোমরে উঠে গেছে, আস্তে করে টেনে নামিয়ে দেয় সেটা।

মেয়েটাকে একটু আদর করতে যায়। সে ফোঁস করে ওঠে। হঠাৎ তার হাতের খেলনাটার দিকে সত্যর নজর পড়ে। সটা কেড়ে নিয়ে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে! 'এও সম্ভব!' বিড়বিড় করে সে। বাচ্চাটা চিৎকার জুড়েছে 'আমার বেলুনটা দাও…!'

'এটা বেলুন নয়…' বলে জানলা দিয়ে ফেলে দেয় বস্তুটা। বাচ্চাটার চিৎকার আর থামে না। উজ্জ্বলা, অমৃত দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায়। বাচ্চাটা যত চিৎকার করে উজ্জ্বলাও ততই চিৎকার করে। 'একটা কিছু দেবার মুরোদ নেই…কি বলে তুমি ওর বেলুনটা ফেলে দিলে…।' অমৃতও হাই তুলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল…সত্য ওদের থামিয়ে দিয়ে বলে—'চুপ করো! ডিবচ! তোমরা খুব ভালো করেই জানো ওটা বেলুন নয়!' ওরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অপ্রস্তুত অমৃত ঢুকে যায় বাথরুমে। শার্ট-প্যান্ট পরে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সত্যর সামনে এসে দাঁড়ায়—

'স্যার…' সত্য চুপ করে থাকে। আবার ডাকে সে। সত্য তাকায় তার দিকে। অমৃত চোখ নামিয়ে নেয়। করকর করছে সত্যর চোখ। একটু বাঁকা হাঁসি হাঁসে। অমৃতের বন্ধু অপু যখন সত্যকে ওদের সম্বন্ধে বলতে এসেছিলো সে অপুকে এমন ধমকে ছিল যে অপুর এ বাড়ি আসাটাই বন্ধ হয়ে গেছে, 'দ্যাখো অপু আমি যদি কোনদিন নিজের চোখেও দেখি উজ্জ্বলা ব্যাভিচারে লিপ্ত, আমি আমার চোখ দুটো গেলে দেবো তবুও বিশ্বাস করবো না…' সত্য নিজেই বিড়বিড় করে…'তাহলে সত্য! এখন কেন চোখটা করকর করছে! গেলে দাও চোখ দুটো…'

অমৃত কখন চলে গেছে সত্য জানে না। উজ্জ্বলার আক্রমণে ওর সম্বিত ফিরে এলো, 'শুয়োরের বাচ্চা'—উজ্জ্বলা ওর পাঞ্জাবির গলাটা চেপে ধরে ঝাঁকানি দেয়…'বেশ করেছি…আমার এ শরীর নিয়ে আমি…' একেবারে চরমে গলা চড়িয়ে সত্য চেঁচিয়ে ওঠে…

'উজ্জ্বলা!' বাচ্চা দু'টো চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে…উজ্জ্বলা আর কি একটা বলতে যাচ্ছিলো। সত্য সপাটে ওর গালে একটা চড় কষায়।

পাঞ্জাবির মুঠোটা আলগা হয়ে খসে পড়ে। নিজের বালিশের নিচ থেকে ছুরিটা বার করে তেড়ে যায় উজ্জ্বলার দিকে। ঘরের কোণে আলমারির গায়ের সঙ্গে সেঁটে থরথর করে কাঁপতে থাকে সে। ভয়ে সারা মুখ রক্তশূন্য…। ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়… 'ডিবচ, হোর! কাওয়ার্ড'…। আগের উজ্জ্বলা হলে ছুরিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, ঘা-খাওয়া কুত্তির মত ঘরের কোণে ঠেসে গিয়ে থরথর করে কাঁপতো না · '

নিজের ঘরে ফিরে আসে সে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ডেস্কের ওপর রাখা গ্লোবটার দিকে।

হঠাৎ তার ভাবনা অন্য খাতে বইতে শুরু করে। আচ্ছা এটা কি আমার ব্যক্তিগত লাভক্ষতির প্রশ্ন বলে ভাবছি? তা হলে তো অন্যায়! 'রাশিয়া' হয়েছে। 'চীন' হ'লো, এবার না হয় উজ্জ্বলা যাবে। কি যায় আসে তাতে তোমার সত্য? আস্তে আস্তে ওর উত্তেজনাটা কমে আসতে থাকে। কলমটা টেনে নিয়ে লিখতে থাকে—'যতদিন উজ্জ্বলার সামনে, নিজের এবং বাচ্চা দু'টোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সমস্যাটাই এক মস্ত সমস্যা ছিলো —ততদিনই অস্তিত্ব বিপন্নকারী এই ব্যবস্থার সবকিছুকেই ঘৃণা করেছে। সেই সমস্যাটা যেই সমাধান হয়েছে একটু সে আর সামনে শত্রু পাচ্ছে না। সবময় টেনশন ছাড়া ও একটুও বাঁচতে পারে না। পুরনো পাপ তাকে গ্রাস করে একটু একটু করে · '

উজ্জ্বলা এবং বাচ্চা দুটো কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ওর খেয়াল নেই। সত্য লিখে চলে…'লোহাকে যতক্ষণ আগুনে রাখবে ততক্ষণই লাল থাকবে এ প্রক্রিয়া চালাতে হবে যতদিন না লোহাটা কার্বন এবং অন্যান্য ভেজালমুক্ত হয়। পাঁচ হাজার বছর ধরে, লোভ-লালসার যে বিকৃতিতে এই সামাজিক শ্রেণীটা শতাধীন হয়েছে, এদের কি কোনদিন টেম্পারড্ করে খাঁটি ইস্পাত করা যাবে?

আসলে এ সেই অংকের পাজল · এক্স টেন্ডস টু ইনফিনিটি।

বাট নেভার অ্যাটেইনস ইট…সব সময়ই খাঁটি হবার দিকে ছুটছে… কিন্তু…'

হঠাৎ বাইরের একটা প্রচণ্ড গোলমালে সত্যর লেখা থেমে গেল। ব্যাপারটা কি দেখতে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই পাড়ার একদল যুবক এবং মহিলা দরজা ঠেলে ওর ঘরে ঢুকে পড়লো।

কী হয়েছে বোঝার আগেই কয়েকজন এগিয়ে এসে ডেস্ক থেকে সত্যর লেখাগুলো নিয়ে ফড় ফড় করে ছিঁড়ে ফেলে। সত্য বাধা দেবার সময় পর্যন্ত পেল না। একজন ঘাড় ধরে সত্যকে দরজার কাছে ঠেলে দেয়…'পাড়াতে আমরা কোন বধূ নির্যাতনকারী থাকতে দেবো না।…'সত্য কি বলতে যাচ্ছিলো একটা ছেলে হাতের চেটো দিয়ে ওর ঠোঁটের ওপর একটা থাবা বসালো '…শালা, বিপ্লবী মারানো। যাও শালা এখান থেকে…' এদের সকলকেই সে চেনে, চেনে এদের বাবা-কাকাকেও। এরা এখন যুবক! রাজনীতি করে, সমাজসেবা করে…

মুখটা চেটে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়…'নারী মুক্তি করছো? সেটা ভালো। কিন্তু বাবাজীবনরা লেনিন বনাম ক্লারা জেৎকিন লেখাটা পড়েছো?'

'হুম! উনি এখন লেনিন মারাচ্ছেন! লেনিন কি ভি সি আর, ভি-ডি-ও-র যুগে জন্মেছিল…'

সত্য হাসে। হো হো করে হাসে। কে একজন ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মারে…তাকিয়ে দেখে… 'তা হলে তো বাবাজীবন কমরেডরা ভাদুরে কুত্তিগুলোর মুক্তির জন্যও লড়তে হবে।…তোমাদের মত ক্যাডার দেখেই আরওয়েল, রাসেল সুযোগ পায় '

একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। কপাল বেয়ে রক্ত ঝরে। বাচ্চা ছেলেটা ছুটে আসতে গেলে উজ্জ্বলা ধমক দেয় '…এত যদি দরদ! চলে যা না ঐ নচ্ছারটার সঙ্গে!…' সে থমকে দাঁড়ায়… 'আর ন্যাকামো করিস না।' চুপ কর!…মেয়েটা বলতে থাকে, …'মায়ের কোন দোষ নেই…বাবা তো'…একটা মহিলাকণ্ঠ দাবি জানায়, 'উজ্জ্বলাদি আমাদের কমরেড! এখানকার মহিলা সমিতির সহ সম্পাদিকা। কালই কাগজে বিবৃতি দিয়ে দাও…'

সত্যর মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবার আগে তার নজরে পড়ে আজকের কাগজটা পড়ে আছে। ওটা তুলে নেয়। কাগজে হেডিংটা দেখার জন্য একটু থামে…

গর্বাচভ বলেছেন…'অদূর ভবিষ্যতে একজন অকমিউনিস্ট রাশিয়াকে শাসন করবে!…'

ভেতর থেকে ওদের বিজয় চিৎকার কানে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে সত্য…

'· মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান
রাখিবে না মোহগর্তে
তাই লিখে দিলে বিশ্ব নিখিল
দু' বিঘার পরিবর্তে'….'

সত্য গলা মিলিয়ে যায়…চরৈবেতি সত্য! চরৈবেতি।

উজ্জ্বলা মহিলা সমিতির নেত্রী হলো…উজ্জ্বলা এবং আমি

একটা মেসে সত্যকে আবিষ্কার করার পর জিজ্ঞাসা করলাম 'সিদ্ধান্তটা কি অপরিবর্তনীয়!'

'হ্যাঁ আজিজদা!' ওর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'সত্য, তোমার খারাপ লাগছে না?'

'খুউব! রাশিয়া গেছে, চীন গেছে, সেগুলোই যদি সহ্য করতে পারি এটা কেন পারবো না?…' চোখ ছলছল করছে ওর। সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। নিজের বিছানাতে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। উদাস কণ্ঠে আবৃত্তি করে…

'দিটঠাবা এচ অদিটঠা
এচ দূরে বসন্তী চ অবিদূরে,
ভূতো বা সম্ভবোসি বা
সব্বে সত্তা সুখী তাত্তা…'

এবার চোখ জ্বালা করার কথা আমার। এ তো দার্শনিক সত্যের কামনা নয় এ যে এক পিতৃহৃদয় সর্ব-চরাচরের সুখ কামনা করছে—'দৃশ্যাই হোক, অদৃশ্যাই হোক দূরেরই হোক কিংবা নিকটেরই হোক, অতীতই হোক, কিংবা ভবিষ্যৎ…সকলেই, সুখে থাকুক!' ভি-সি-আর পারল না কেন পিতৃহৃদয়ের এই পরিচয়টাকে

শর্তাধীন করে তুলতে !

চলে আসার জন্য পা বাড়ালাম। '…আজিজদা, ওদের ভুল বুঝবেন না। 'ইটস টাইম'স প্লেগ…। যুগের মড়ক !' তাকালাম ওর দিকে…'বড্ড মনটা খারাপ করে বাচ্চাগুলোর জন্য…।' ওকে সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে বললাম…

দিটঠাবা এচ অদিটঠা
এচ দূরে বসন্তী চ অবিদূরে,
ভূতো বা সম্ভবোসিবা…'

সত্য সব কিছু উজাড় করে গলা মেলালো…'সব্বে সত্তা সুখী তাত্তা' টলতে টলতে মাতালের মত বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। একবার পেছন ফিরে দেখলাম তথাগত সত্যকে। সেও আমার নিষ্ক্রমণটা দেখছে। রাশিয়া, চীন, উজ্জ্বলার নিষ্ক্রমণ দেখেছে… দেখছে আমারটাও…

ওখান থেকে সোজা যখন উজ্জ্বলাদের ফ্ল্যাটে গেলাম—বেলা একটা। তখন ওরা ঘুমুচ্ছে। কড়া নাড়ার শব্দে বাচ্চাটা এসে দরজা খুলে চিৎকার করে মাকে আমার আগমনবার্তা জানিয়ে দিল—'মা আজিজুল জেঠু এসেছে।' বুঝতে পারলাম বেলা একটার সময় রাতের ঘুম ভাঙানোটা অন্যায় হয়েছে। কাঁচা ঘুম ভাঙার বিরক্তি মেশানো কণ্ঠে উজ্জ্বলা বাঁকা প্রশ্ন করে—'কি, প্রিয় ক্যাডারের খবর কি ?' একটু তেতেই গেলাম ওর কথার ধরনে।

'সেটাই তো জানতে এলাম ! ওকে কি গুম করলে নাকি ! এর আগেই তো বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে ঝেড়ে দেবার চেষ্টা করেছিলে …সেই যাত্রা বাঁচিয়েছিলাম ? বলো এখন সত্য কোথায় ?…'

মাথা নিচু করে উজ্জ্বলা জবাব দেয়, 'জানি না, বিশ্বাস করুন জানি না। জানি সত্য আমাকে ছেড়ে গেছে !'

'বলো অমৃত কোথায় ? ওই ডিবচটাকে আমি খুন করব নিজের হাতে। ওদের তিন পুরুষের রোগ এই ডিবচারি ! ওর জ্যাঠা এক এক করে তিনটি বিবাহিত মহিলার সর্বনাশ করে তারপর নানান কেলো করে একটার সঙ্গে কাটাতে বাধ্য হয়। ওর বাবাও তাই। মাতাল জুয়াড়ী, সেরেফ প্রশান্ত মহালনবিশ, আর রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে লোক ঠকিয়ে যাচ্ছে…বলো সে কোথায়' ?

হঠাৎ উজ্জ্বলা ক্ষেপে যায়—'তুমি কি পুলিসী জেরা করবে নাকি !'

'কেন সত্য চলে গেল ? সে তো থাকতেই এসেছিলো ?' সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছি। ওকে নিঃশ্বাস ফেলতে দেওয়া চলবে না···বদমায়েশ মেয়ে একটা ··'

'আসলে কি জানো ? মেয়েদের শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলো যদি তোমরা খুলে নিয়ে নিজেদের ব্যাগে ভরে অফিস, কাছারি করতে পারতে তাহলেই খুশি হতে···' বুঝলাম উজ্জ্বলা এখন কি পড়ছে, কি ভাবছে···''আজকাল কমিউনিস্ট পার্টিতে, নারীমুক্তি প্রসঙ্গে 'ফিমেল ইউনাখ' বইটা পড়ানো হচ্ছে নাকি ? তা' সেটা যখন করা যাচ্ছে না···সুতরাং···তোমরা···সেগুলোকে সব সময়ই শান দিয়ে যাও···যাতে মরচে ধরে না যায়···'' চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম কথাগুলো। উজ্জ্বলার মাথাটা বুকের সঙ্গে মিশে গেছে। ঘাড় নিচু করে বিড়বিড় করছে ··'কি যে হলো··· হঠাৎ মনে হলো বড্ড···' 'একঘেয়ে তাই তো ?' ওর বাক্যটা শেষ করেই আক্রমণ হানলাম, 'আসলে তোমার খুলির নিচটাতে আছে শুধু জননেন্দ্রীয়···তারা সব সময়েই নতুন নতুন সঙ্গী চায়। আর তোমরা স্বামীদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ খাড়া করে নিত্য নতুন বিছানায় শোয়াটাকেই নারীমুক্তি বলে চালাতে চাও···।' উজ্জ্বলা হতভম্ব ; একই দমে বলে চললাম····'আসলে তোমরা কি একবারও ভেবে দেখেছো, এগুলো মুক্তি না বন্ধন ? তোমাদের এই দর্শন কি পুরুষ আধিপত্যকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে না ? তোমরা কি প্রমাণ করছো না সেই কুখ্যাত পুরুষশাসিত প্রবাদ, 'টু লিবারেশন অব আ ওম্যান লায়েজ ইন বেড··· ?' আক্রমণের তোড়ে উজ্জ্বলার স্বর আরও নেমে আসে। থতমত খেয়ে বলে 'তাহলে কি একটা মেয়ের পরিচয় শুধু মা, না হয় কারোর বউ ?···'

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোমার কাছ থেকে এরকম পাতি যুক্তি আশা করিনি। আর একটু ধারালো আক্রমণ আশা করেছিলাম।'

'তা হলে ?···'

বুঝলাম পেশেন্ট রেডি। এবার টেবিলে তোল। 'সাজেশানে'

ফেল। 'স্বামীর কাজ এবং চিন্তা যদি প্রো-পিপল হয়....তার সঙ্গে মিশে যাও। স্বতন্ত্র থাকতে গেলেই তো এই সমস্যা। আর তোমার স্বামী? দেশের একটা অংশ মানুষই তো তার সঙ্গে আইডেণ্টিফায়েড! তুমি কে এমন তালেবর?'

'না, মানে....'

'ওই মানে-ফানে ছাড়ো। ইতিহাসটা ভুলে গেছো? বিবর্তনের ইতিহাসে প্রাকৃতিক শ্রম বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল। প্রজাতিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তেছিল মেয়েদেরই ওপরই। এটাকে অস্বীকার কী করে? এটা তো শর্তহীন শর্ত। তুমিও এতদিন তাই করেছিলে। যখন দেখেছিলে আর্থ-সামাজিক অবস্থা তোমার বাচ্চাদের ধ্বংস করতে উদ্যত...তুমি তাকে মোকাবিলা করেছিলে? নিজের কথা ভাবনি? আজ তুমি বাচ্চা দুটোকেই শেষ করে দিচ্ছো...ওদের ভাসিয়ে দিচ্ছো...।'

উজ্জ্বলা চমকে একবার ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখে নেয়. 'প্রেম ছাড়া একজন সক্ষম নারী বাঁচতে পারে?'

'তা স্বামীর সঙ্গেই প্রেম করো না...'

'তেল, লকড়ি, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ....'

'সব এসে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের পথকে বার বার বিচ্ছিন্ন করে দেয়...তাহলে সমাধানের উপায়?...'

'কেয়ার-ফ্রী প্রেম...'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো একজন সক্ষম নারীর জীবনে কম করে তিনটি পুরুষ লাগবে, --সামজিক প্রতিষ্ঠার জন্য একজন স্বামী, কেয়ার-ফ্রী প্রেমের জন্য একজন হাঁটুর বয়সী ছোকরা আর ফাইনান্স করার জন্য একজন ফাইনান্সিয়ার!...আর তা না হলে এমন অবস্থা তৈরি করা যেখানে তেল লকড়ি ভবিষ্যৎ হামলা করে প্রেমকে বাধা দিতে পারবে না...

সেই চেষ্টাতেই ছিলে তোমরা? একবার হেরে গেছো...তাতে কি হয়েছে? আবার চেষ্টা করো...'

'তা হ'লে '

ছাড়ো ওসব চিন্তা! তোমার ভাই-এর বউ যদি এসব করে তুমি মেনে নেবে? তুমি তোমার মেয়েকে তার সঙ্গে মিশতে দেবে?

তোমাকে যারা এসব শেখাচ্ছে, তোমার পেছনে তারা তাদের নিজেদের মেয়ে বউকে তোমার সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এটা বুঝছো না কেন তুমি ? তুমি করবে সংগঠন··· ?'

'তা হ'লে··· ?'

"ছাড়ো ওসব ! নারী মুক্তির ওসব তত্ত্ব আসলে 'মেনাপোজগ্রস্ত মহিলাদের মানসিক বিকৃতি···'ছাড়ো ওসব···তার চেয়ে বরং চলো একটা আবৃত্তি করি···যেমন আমরা করতাম····সত্য শুনতো····'

'একটা কবিতা শোনাই—শোনো'

উজ্জ্বলা বিড় বিড় করে বলে—'এই ক'মাসে সব ভুলে গেছি অজিজদা····

ওকে থামিয়ে দিলাম। ঠিক আছে। মনে পড়লে ধোরো····

"প্রতিটি পথ এখন অপেক্ষায় অধীর—
অথচ কোন ঘণ্টা জাগিয়ে তুলছে না নব বসন্তের প্রত্যাশা,
দিন যাপনের চাকার দাগ বসে গেছে আমাদের আত্মায়,—
এই তো সময় যখন মায়াবী ভালোবাসাকে যাচাই করে
দেখা দরকার।
ধন্য সেই মুহূর্ত যা একটা প্রিয় মুখকে চোখের আয়নায়
ফিরিয়ে আনে,
ধন্য সেই লগ্ন যখন অশান্ত হৃদয় পায় বিশ্রামের নীড়।
অবহেলায় যদিও নাকচ পানপত্র আর সাকী,
তবুও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে
সাইপ্রেস আর চিনারের পাতা ছুঁয়ে—
ঘুরে ফিরছে ঠাণ্ডা মেজাজের মেঘমালা—
তাদের সেই ছায়াঘন সবুজ নর্তকী মুহূর্তগুলোকে
অনুভব করার মতো কোন কমরেড আর আমাদের মধ্যে নেই !
বিচ্ছেদের ঐ দগদগে ঘা গুলো একদিন জ্বালিয়ে
মারতো আমাদের,
সে সব বন্ধুরা কোথায়, কতদূর এখন !
শিকল আর ফাঁসিকাঠেরই তো আজ মোচ্ছব,
প্রয়োজন আর বাছাই এর এই তো সময়। ··

উজ্জ্বলার চোখ থেকে কোন সময়েই চোখ সরাইনি · বার বার ওকে চোখের ইসারায় ধরতে বলছিলাম····হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সে গলা মেলায়····

'খাঁচা তোমার হুকুমবরদার হতে পারে
কিন্তু ফুটে ওঠার লগ্নে গোলাপের লাল টকটকে আগুন—
'থোড়াই পরোয়া করে তোমার !'
ভোরের হাওয়ার চঞ্চল পায়ে বেড়ি পড়ায় কে ?
বসন্তের উজ্জ্বল প্রহরকে বাঁধবে সে ফাঁস কোথায় !
আমরা যদি না-পারি,
চোখ ভরে অন্যেরা একদিন দেখে নেবে
কোকিলের গান আর ফুলের সৌরভ ম-ম দিনগুলি রাতগুলি !'
(ফয়েজ আহ্‌মদ, অনুবাদ অমিতাভ দাসগুপ্ত)

কবিতা শেষ। ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ। মঞ্চ অন্ধকার····'ভুলুণ্ঠিতা কাঁদে শকুন্তলা····'

দুঃখ হয় ওর জন্য। বললাম, 'তাহলে আজ উঠি····'

মুখ তোলে সে। চোখ দিয়ে তখনও জল পড়ছে। মোছার কোন চেষ্টাও করছে না ··'আজিজদা !!'

নরম গলায় উত্তর দিলাম, 'বলো' !···ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছি। ··

'সত্যকে আসতে বলবেন ··'

দরজার বাইরে পা বাড়িয়ে বললাম— 'না, তা হয় না, উজ্জ্বলা ! উজ্জ্বলা আর সত্য একসঙ্গে থাকতে পারে না।···

পেছন পেছন আসছিলো হঠাৎ থমকে গেল উজ্জ্বলা ! স্পষ্টতই একটা চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। মুখ না ফিরিয়েই বললাম, তথাগত সত্যের বাণী শোন···

'দিত্‌থাবা এচ অদিত্‌ থা
এচ দূরে বসন্তী চ অবিদূরে
ভূতোবা সম্ভবোসিবা
সব্বে সত্তা সুখী তাত্তা···'

বলতে বলতেই চলছিলাম এবং চলতে চলতেই নিচ থেকে

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি উজ্জ্বলা দাঁড়িয়ে···এগিয়ে চললাম···· কানে বাজছে···'সত্যকে আসতে বলবেন····সত্যকে একবার আসতে বলবেন! সত্যকে একবারটি বলুন আসতে!····'

এ কি। উজ্জ্বলা তাহলে রিকন্ডিশনিং হলো! তাহলে কেন চীন হবে না?

কোন রাশিয় ফিরবে না কক্ষপথে?

সত্য তোমারই জয়! ইউরেকা! সত্য লেখ···নিশ্চয়ই সকলে সুখী হবে····তুমিও····।

বুকের ওপর কাস্তে হাতুড়ি, পাঁজরার নিচে পদ্ম

পাড়ায় ভীষণ টেনশন দু নম্বর কলোনির সব লোক 'পদ্ম' হয়ে গেছে। ভি ডি ও দেখে ক্ষেপে গেছেন তাঁরা। এই অঞ্চলে জানতাম একটা বেকার ছেলেই 'পদ্ম' হয়ে ফুটেছিল। সাত হাজারি 'পদ্ম'। অর্থাৎ 'হোলটাইমার'। আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে যথেষ্ট। তাকেই ধরলাম 'ভি ডি ও'টা দেখাতে হবে। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে দেখলাম, শুনলাম। দেখলাম সশস্ত্র বাহিনীর বেইমানি। শুনলাম মুসলমানদের অপকীর্তি। একটা ঘর্ঘর শব্দ তুলে সর্বক্ষণ 'সাউন্ড এফেক্ট' ধরা হয়েছে। ওটা বিজয় রথের চাকার শব্দ। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো মিথ্যার বেসাতি দেখে! 'পুলিস প্রশাসন কি এগুলো জানে না?' সাত হাজারি পদ্ম জবাব দিল, 'আলবৎ জানে! সি পি এম. সি পি আই সব বাড়িতেই ভাড়া যাচ্ছে এটা!' তার মানে আরও কিছু কমিয়ে নিচ্ছ তুমি! তাই তো? তুমি কি জানো? যে সালটা তোমরা মানো, পুজো করো, সেটা প্রবর্তন করেছিলেন একজন মুসলমান। তাঁর নাম 'আকবর'! 'ওসব জানার দরকার হয় না।' বুঝলাম না জানাটাই পুঁজি। তা একটা সত্য কথা অন্ততপক্ষে বলবে, 'দু নম্বর কলোনির সব লোকগুলো কি এই ভি ডি ও দেখেই ক্ষেপে গেছে! আমার তো মনে হচ্ছে কৃতিত্বটা তোমার!'

'হেঁ হেঁ ঠিক ধরেছেন দাদা। এ শালা ভি ডি ও কি করতে পারে! আমাদের বঙ্গসেনার প্রধান আর 'বাবা' বলেছেন ওপার বাংলা থেকে যে যত বেশি লোক আনতে পারবে লোকপিছু পাঁচ

টাকা !....'

'লোকগুলোকে নিয়ে কী করবে ?

'বঙ্গসেনার অফিস আছে না ? হেড কোয়ার্টার্স' ।....

বাগুইহাটি জগৎপুর বাজারের ওখানে। উনি বলেছেন লোকগুলো খালধার বরাবর বসিয়ে দেবেন। তারা প্রচার করবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। পাশে, হাতিয়াড়া আর জ্যাংড়া অঞ্চলের মুসলমানদের তাড়াতে পারলে ফ্যামিলি পিছু ১৫ বিঘা করে জমি হবে।....এখানকার লোকদের তো আত্মীয়স্বজন সব ওপারে ; তাই ইনাদের বললাম' ।....'বুঝলাম কৃষক 'অরিজিন' এই সমস্ত মানুষগুলোর চিরাচরিত জমির ক্ষুধাকে কাজে লাগিয়েছে। 'তুমি তো করো বি জে পি, তার সঙ্গে বঙ্গসেনার যোগ কোথায় ?'

"সব একই দাদা। 'বাবা' বলেছে অস্ত্র দেবেন, বি জে পি টাকা ! আর যদি জিতে যাই মুসলমানগুলোকে একেবারে পদ্মাপার !"

'হুম, পদ্ম আর পদ্মা তাই তো ?' চলে এলাম। মাথা ভর্তি আগুন। সকালে উঠেই ধরলাম এলাকার মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিকে।...'দাদা এগুলো কি হচ্ছে ? এর বিরুদ্ধে বলুন !'—'কী করে বলবো, ঘটনাগুলো তো সত্য ?' তিনি উত্তর দিলেন।

'সত্যি ? কোন্ ঘটনা ? মন্দির ভাঙা ?' মন্দির গড়ার ঘটনাগুলো সত্যি নয় ? দিল্লীর স্থাপত্য সত্যি নয় ? আগ্রা সত্যি নয় ? সব থেকে বেশি মন্দির যে ভেঙেছে তার নাম তো কালাপাহাড় ! আওরঙ্গজেব নয় ! সব থেকে বেশি মন্দির গড়েছে যে সে তো আওরঙ্গজেব।...'

'ওসব আঁতলেমি করার সময় এখন নয়। ওসব করতে গেলে নির্বাচন জেতা যাবে না।...' উনি চলে যেতে উদ্যত হ'লে আবার থামালাম—'আর ঐ জমির ব্যাপারটা। ওটার মুখোশ খুলে দিন।'

"পাগল' এরই জন্য আপনাদের কিছু হলো না ! ওরা যদি বলে জগৎপুরের পচা খালের ধারে ১৫ বিঘে জমি দেবে, আমরা বলবো মুসলমানদের না তাড়িয়েই এই শহরের কাছেই আমরা বিশ বিঘে জমি দেবো।'

'কোথায় পাবেন ? লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে !'

'তখন ? তখন ন' পাড়া দেখিয়ে দিলেই হবে !' আমরা কি সত্যি সত্যি দিচ্ছি ! না, ন' পাড়াতে যাচ্ছি !' মুসলমান অঞ্চল ন' পাড়া ! চমকে উঠলাম। 'দেখছেন না ওদের আনা লোক আমাদের হয়ে যাচ্ছে। টাকা দিয়ে লোক আনছে ওরা রেশন কার্ডের ব্যবস্থা, রিলিফের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমরা। ওরা কি ক্ষ্যাপাটাই না ক্ষেপে গেছে !'

চলুন না আজ দু নম্বর কলোনিতে গিয়ে মিটিং করি। চলে যেতে যেতে উনি উত্তর দিলেন—'না। করলে আমরা একলাই করবো !'

চেঁচিয়ে বললাম, 'দাদা ! আপনাদের কৃতিত্ব আছে আপনারা ইঁটে পদ্ম ফোটালেন ! চিরকাল জানতাম পাঁকেই পদ্ম হয়। একটা একটা করে ইঁট জমতে দিলেন—সেই ইঁট আজ শত পদ্মে প্রস্ফুটিত হয়ে হাসছে···এই তেরো বছরে আর কিছু না পারুন, শীতে আধমরা একটা সাপকে বুকের তাপে বাঁচিয়ে তুলেছেন···'

'আপনারা সব আকাশচারী ! ধর্ম'টা'···নিজের বুকের দিকে আঙুল দিয়ে হৃদয়ের স্থানটা দেখিয়ে বললেন 'মানুষের এখানে থাকে বুঝলেন !'

রাগে তখন কাঁপছি, 'আলবৎ বুঝেছি ! জামার উপর কাস্তে হাতুড়ি আর পাঁজরার নিচে পদ্ম। তাই তো ?'

যেইসান-কে-তেইসান

এ ব্যাটারা হিন্দুকার্ড খেলছে ! সুতরাং আমিও ঠিক করলাম প্রমাণ করবো এরা আদৌ হিন্দু নয়। এরা লোককে হিন্দু বানাচ্ছে, সেইটাকেই কাজে লাগাবো আমি।

'ববের' পাঠানো ক্লিপিং আর ছবিগুলো নিয়ে বসলাম। বব আমেরিকান। সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার। পাকেচক্রে আলাপ। ও প্রায়ই মজার মজার নোট দিয়ে বিভিন্ন ছবি এবং ওখানকার কাগজের কাটিং পাঠায়। শর্ত একটাই সেগুলো আমি ব্যবহার করতে পারি তবে সেগুলোই ছাপাতে পারবো না। ৮৯ সালের বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের কয়েকটা ছবি আছে। আমার দরকার সেই ছবিটা। এ দেশের একজন নেতা সেই সময় চিকিৎসার জন্য

গিয়েছিলেন। তিনি একটা ভোজসভাতে পাকিস্তানের মৌলবাদী নেতার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাচ্ছেন। ববের নোট—'ক্যান য়ু গেস হু হি ইজ? অ্যান্ড হোয়াট হি ইজ টেকিং?' রথের সারথিকে কে না চেনে? কিন্তু নুরানীর সঙ্গে কেন? তিনি খাচ্ছেন 'বীফ স্টেক!' আজ ওর ভণ্ডামি শেষ করবো। সঙ্গে নিলাম অনেকদিন আগে সংগ্রহ করা অমৃতবাজার পত্রিকার একটা ফোটোস্ট্যাট কপি। বাংলা বিভাজন নিয়ে তিনজন নেতার বিবৃতি। আবুল হাসিম (মুসলিম লীগের সভাপতি), শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি'র দাবি। প্রথম দু'জন বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হুমকি দিয়েছেন বাংলা ভাগ না-হলে দেশে আগুন জ্বলবে। ওঁরা উদ্বাস্তু তৈরি করেছেন, এঁরা এখন তাঁদের নিয়ে ব্যবসা করেছেন।

ভরদুপুরে বাড়ির সকলকে আতঙ্কে আর আশঙ্কায় ফেলে রেখে টুকটুক করে চলে গেলাম দু নম্বর কলোনিতে।

কলোনি যেমন হয় তেমনই। কলোনি উন্নয়ন কমিটির কাজ শুধু বছরে একটা পুজো করা আর বর্ষার আগে রাস্তায় কয়েক ঝুড়ি ঘেঁষ বিছিয়ে দেওয়া। শতকরা একজন লোকও চাকুরিজীবী নেই। গোটা পরিবার উদয়াস্ত খেটে কোনরকমে দুটো ভাত জোটায়। তাও 'পালিশ চাল' জোটে না। 'রবার চাল' ওদের প্রিয়। 'পালিশ চালে'র ভাত বড্ড তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। পেচ্ছাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়! গোটা ষাটেক ঘরের বাস। রায়ট বা রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে কারুরই চলে আসাটা সম্পর্কযুক্ত নয়। প্রত্যেকেই এসেছেন বাংলাদেশে যে বেসরকারী দুর্ভিক্ষ চলেছে তার তাড়নায়। উচ্চবর্ণের লোকের সংখ্যা নেই। বেশির ভাগটাই কৈবর্ত এবং মাহিষ্য। এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোক এক এক এলাকায় থাকেন। দু একটা বাড়ির অবস্থা ভাল। তারাই আগে এসেছেন। তাঁদের বাড়ির চৌহদ্দিটাও বড়। একটু আধটু জমিও দখল করে রেখেছেন। একটু আলোচনা করলেই বোঝা যায় এরাই আড়কাটি হয়ে লোকগুলোকে এনেছেন।

বাড়ির মেয়েরা বাদাম ভাজেন, চিঁড়ে-গুড়ের মোয়া তৈরি করেন, টব বানান, সন্দেশ বানান, গরু পোষেন, সক্ষম পুরুষেরা

সেগুলো ফেরি করেন, ট্রেনে কিংবা পাড়ায় পাড়ায়। ছেলেরা আজকাল সকালে এক দু ঘণ্টা স্কুলে যায়, বাকি সময় কাগজ কুড়োয় কিংবা ভাঙা শিশি-বোতল, লোহা, পুরনো কাগজ কিনে আনে।

জমি, মাটি আর জলকে নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে যাদের সমস্ত সংস্কৃতি, আবেগ, জীবিকা আর স্বপ্ন আবর্তিত হয়েছে তাদের অবস্থা এক কথায় জল ছাড়া মাছ। যাঁরা বুকের মধ্যে সব সময় জলের ডাক শোনেন, আড়কাটিদের ডাক তাঁদের কাছে ছিলো ডোবা থেকে বৃহত্তর জলাশয়ের হাতছানি। এই হাতছানিতে ভুলে কানকোতে ভর করে এরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। রাস্তায় কিছু খেয়েছে চিলে, কিছু হয়েছে ধ্বংস। অবশেষে আমাদের শাসক পার্টির গামলায় জিয়ানো আছে।

'ব্যাঘ্রশাবক, মুখুজ্জে-তনয়' এদের ডেকে এনেছিলেন তার পিছনে অন্য যেকোন কারণই থাক, খুব সাদা চোখে একটা সত্য ধরা পড়ে উঠতি মাড়ওয়াড়ী এবং উত্তরপ্রদেশী যারা কলকাতা এবং আশেপাশে গেড়ে বসেছিলো তাদের সস্তায় শ্রমিক সরবরাহের উদ্দেশ্যই ছিল এর একটা কারণ। এখনও এদের বাচ্চাদের যোগাড় করা লোহালক্কড় জমা হয় তাদেরই গুদামে। এরা পুলিশের গুঁতো খেয়ে চাল পাচার ক'রে, বিড়ির পাতা চোরাই ক'রে যে পয়সা পায় সেটাই চলে যায় বড়বাজারে। এদের মেয়েরা বিনি পয়সাতে (প্রায়) গড়ে দেয় 'লিজ্জৎ' পাপড়ের মালিকের সৌভাগ্য !

আজও আদবানীজী'র আড়কাটি বঙ্গসেনা, 'বাবা' ইত্যাদিরা এঁদের ডেকে আনছেন সেই একই উদ্দেশ্যে। উত্তরপ্রদেশের আখ এবং ডাল চাষে চালান হচ্ছেন এঁরা। যমুনার দু'ধারে এঁদের ভিড়। দিল্লীতে বাড়িতে কাজের লোক এঁরাই।

তাই সেই দাদা-মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীকে সেদিন কাগজ খুলে দেখালাম, 'আচ্ছা দাদা, বলুন তো পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী এলাকার শতকরা ৮০টা বাড়িই ছিলো মুসলমানদের। এই সমস্ত মুসলমানরা দেশ ছেড়ে চলে গেল। বাড়ি বণ্টনের দায়িত্ব ছিলো হিন্দু নেতাদের। স্বয়ং ব্যাঘ্র শাবকের চেলা-চামুণ্ডাদের। এই অঞ্চলের শতকরা একভাগ বাড়ি, কিংবা কমপ্লেক্স বাঙালি হিন্দুদের

কপালে কেন জুটলো না? সব পেয়ে গেল হয় পার্শি, না হয় অবাঙালি হিন্দু, দু চারাটে শিখ ব্যবসায়ী! রহস্যটা কোথায়? 'উদ্বাস্তু' সমস্যার জন্য কতটা 'রায়ট' দায়ী, আর কতটা কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের মালিক বেওসাদাররা দায়ী এটা ভেবে দেখছেন কি? স্থানীয় শ্রমিকদের একটা স্থায়িত্ব আছে। তাদের দিয়ে যা খুশি করানো যায় না, তাই কি এই 'সমস্যা' তৈরি করা হয়েছে? 'রায়ট' হয়েছে। কিন্তু তাতে তো কৈবর্ত, মাহিষ্যদের ভয় পাবার কিছু ছিল না। এগুলো কেন প্রচারে আনছেন না…' উনি আঁতকে উঠলেন, 'ওরে বাবা! তাহলে একটাও ভোট পাবো না। আশু মুখুজ্জের ছেলেকে ধরে টানাটানি!…' ভোট… ভোটার…

তাই জেলে হয়ে মাছগুলো ধরে আনছেন বঙ্গসেনা প্রধানেরা, সেগুলোকে গামলাবন্দী করে ফেলছেন এঁরা…।

মনে পড়ে গেল ৬২ সালের কথা। বিশ্বনাথদা দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনে। বিধান রায় প্রতিদ্বন্দ্বী। গোটা ছাত্রফ্রন্ট ঝাঁপিয়ে পড়েছে চৌরঙ্গীতে। আমরা ছিলাম রয়েড স্ট্রিট, তালতলা অঞ্চলে। আগে চৌরঙ্গী এলাকায় একটা ভালো সংখ্যক মুসলমান ভোটার ছিলেন —প্রায় ১০/১২ হাজার! ঐ অঞ্চলে কাজের দায়িত্ব ছিল আমাদের। কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না, রাশিয়াতে সব মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, চীন থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আক্রমণ মোকাবিলা করতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। প্রাক্তন স্পিকার নৌশের আলি সাহেব উঁচু টুপি পরে ঘরে ঘরে ঘুরছেন। যত 'মুসলমান কমিউনিস্ট' ছিল প্রত্যেকেই এসে কোরান হাদিশ খুলে বোঝাবার চেষ্টা করছেন—হজরত মোহাম্মদ যে সমাজের কথা বলে গেছেন —কমিউনিস্টরা সেটাই চায়। কিন্তু শুধু কথাতে চিঁড়ে ভিজছে না।

হঠাৎ এক নেতা কিছু ছবি পাঠালেন। রাশিয়ার মসজিদের ছবি। সেখানে নামাজ পড়ছে মুসলমানরা, চীনের হজ-যাত্রীদের ছবি। নির্দেশ এলো এগুলো নিয়ে প্রচার করতে হবে। বলতে হবে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এলে মসজিদগুলো আরও সুন্দরভাবে

সরকারি পয়সায় গড়া হবে। ভেঙে ফেলা তো দূরের কথা…।

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল ! আমি রাজি হলাম না। বললাম, 'রাশিয়ায় যদি এগুলো করা হয়ে থাকে ভুল করা হচ্ছে। ভেঙে ফেলতে গেলে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু প্রার্থণারত ঐ বুড়োগুলোর মত প্রাকৃতিক নিয়মেই যদি ওগুলো ধ্বংস হয়ে যায় যাক। কোনটা বেশি দরকার একটা মাতৃসদন, স্কুল? হাসপাতাল? না একটা মসজিদ? এটাই আমি এলাকার মানুষের কাছে জানতে চাইবো।'

হৈ হৈ করে উঠলেন সকলে। গালাগালি খেলাম দাদাদের। শুনলাম কিন্তু মানলাম না। আমি আমার কায়দায় চললাম। একটা ঘরে একটা ক্লাবও গড়ে উঠলো, সাতদিনে।

ওঁরা ভোট পেলেন আমি পেলাম কর্মী। নির্বাচন শেষ হলো… ওঁরাও শেষ। কিন্তু সেই ক্লাবের কয়েকজনের নাম বলবো? না, থাক! তাঁরা লজ্জা পেয়ে যাবেন! ধর্মকে ভাঙতে গেলে যদি অসুবিধা থাকে, না ভাঙার যুক্তিটা বুঝি, কিন্তু যেখানে সে প্রাকৃতিক নিয়মে ভেঙে পড়ছে তাকে অক্সিজেন দেবার কি দরকার বুঝি না!

গরু খেকো হিন্দু নিপাত যাক/পদ্ম এবার শুকিয়ে যাবে!

সোজা কলোনি উন্নয়ন কমিটির সভাপতির দাবায় উঠলাম। ছোট একটা চায়ের দোকান মালিক। সবে দোকান থেকে ফিরেছেন। হঠাৎ দুপুরবেলা আমাকে দেখে ভিড় জমতে শুরু করে। করবে জেনেই এসেছি। কারণ, প্রথমত 'আজকালে'র কল্যাণে আমি একটা আশ্চর্য জীব ওদের কাছে। জেল ভেঙেছি, গুলি খেয়েছি —আমি নাকি 'কী-না-কী' হয়ে যেতে পারতাম—হইনি। ইচ্ছা করলেই লাখপতি (এখন অবশ্য লাখপতির ছড়াছড়ি!) শখের ফকির! দ্বিতীয় কারণ, আমার নাম। হিন্দুরা ভাবেন নামটা যদি একটু অন্যরকম হতো। তাঁরা তাঁদের মত করে নেন। মুসলমানরা পেলে কাফের বলে কাটবেন, এদিকে বলে বেড়াবেন 'কাজী নজরুল/হক আজিজুল' সকলেই মুসলমান। মুসলান ছাড়া বিদ্রোহী হয়! সেটাকেই ভাঙালাম। ওঁদের সরাসরি আক্রমণ করলাম, 'আপনারা নাকি ন' পাড়ার মুসলমানদের রুটি আর

গেঞ্জির কারখানা লুঠ করতে যাবেন ? তা আমিও তো মুসলমান, আমাকে মারুন ! আমি তো এসেছি ?' সকলে চুপ।

'আপনারা মুসলমানদের অত্যাচারে চলে এসেছেন। তাই না ? কিন্তু দেশ ভাগ, বিশেষ করে বাংলা ভাগ কে করেছেন জানেন ? এই দেখুন ? এই কাগজটা'—পুরনো কাগজের ফোটোস্ট্যাটটা তুলে দিলাম। কাগজটা হাতে হাতে ঘুরছে। কেউ ইংরেজি জানেন না। 'আমাকে বিশ্বাস করেন ? আমি বাংলাতে বলবো ?' কাগজটা আমরা হাতে চলে এলো অর্থাৎ. 'হ্যাঁ বলো !' বাংলা করে বললাম। স্তব্ধ সভা।

বৃদ্ধরা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'শ্যামা মুখুজ্জে !' জওয়ানরা অবিশ্বাসের সুরে বিড়বিড় করলো, 'বাংলা ভাগ মুসলিম লিগ চায়নি !' 'বাংলা ভাগের জন্য জিদ ধরেছিল শ্যামা মুখুজ্জে'—আমি বললাম—"হ্যাঁ, এই পদ্মের আদি 'বাবা' !" আর এবার সত্যি কথাটা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো 'এই আপনাদের মধ্যে ক'জন মুসলমানদের অত্যাচারে এসেছেন, আর কতজন লোভে পড়ে এসেছেন ?' চুপ ! 'লজ্জা পাচ্ছেন ? থাক বলতে হবে না ! আপনাদের এখানে কেন আনা হয়েছে জানেন ? স্থানীয় হিন্দু শ্রমিকদের ঠাণ্ডা করার জন্য। মারওয়াড়ীদের ক্রীতদাস বানানোর জন্য। ভদ্র-বাবুদের সস্তা ঝি সরবরাহের জন্য !' চোখ-মুখে স্পষ্ট পরিবর্তন। 'কোথায় যাচ্ছে আপনাদের ছেলেদের সংগ্রহ করা লোহা-লক্কড়, কাঁচ আর কাগজ ? ঐ মাড়ওয়াড়ী গুদামে। আপনারা যে প্রাণটা হাতের মুঠোয় করে এ-পার করেন, কোথায় যাচ্ছে সেই সুপারি, রেশমী-সুতো আর ছাতা এবং ঘড়িগুলো ? ঐ বড়বাজারের গুদামে ? যে টাকাতে আপনাদের বাড়ির মেয়েরা বাবুদের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে, মারওয়াড়ী কারখানায় পাঁপড় তৈরি করে, পারতো এখানকার কাউকে দিয়ে এই কাজ করাতে ? বলুন ?'

গুঞ্জন উঠছে। আমারও গলা চড়ছে। রাগে কাঁপছি। 'ঐ, ঐ 'পদ্ম' আর 'বাবা'র দল, মারওয়াড়ী আর বাবুদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে আপনাদের ভুলিয়ে এখানে এনেছে। এবার জেলে পাঠানোর ধান্দা করছে। এখানকার ঐ 'পদ্ম' ছোকরাকে জিজ্ঞাসা

করুন না ওর মাইনে কত? জানেন, সাত হাজার টাকা! তার ওপর একটা করে লোক আনলে ও পায় পাঁচ টাকা, আপনাদের মোড়ল পায় এক টাকা। একটু মিথ্যা থাকলে বলুক!' মোটামুটি চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। একটু জল চাইলাম। সাতখানা গেলাস এগিয়ে এলো। বুঝলাম কাজ হচ্ছে। এবার দিলাম মোক্ষম জায়গায় ঘা, 'হিন্দু? বলুন তো হিন্দুরা গরু খায়? আমি মুসলমানের ছেলে হয়েও খাই না। এই ছবিটা তো এখন খুব দেখছেন। ভি-ডি-ও-তে, কাগজে, টি-ভি-তে সব জায়গায়। আপনারা জানেন ইনি সারথী-জী, নয়া রামচন্দ্র, সাত্ত্বিক!' ববের পাঠানো ছবিটা তুলে দিলাম ওঁদের হাতে গম্ভীরভাবে এক একজন দু-মিনিট/তিন-মিনিট করে ছবিটা দেখছেন। যাঁরা ইংরেজি অক্ষর চেনেন বানান করে করে পড়ছেন পাকিস্তান, বীফ ইত্যাদি···। ছবিটা বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো আমার হাতে।

···আর ইনি বাংলাদেশে আর পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্য যারা হিন্দু কাটতে চায় তাদের নেতা নুরানী। এর সঙ্গেই আপনাদের রামচন্দ্রজী কেমন দাঁত বের করে কথা বলছে দেখুন! প্রত্যেকটা চোখে-মুখে ব্যথা! চোখগুলো ছলছল করছে কিন্তু জ্বলছে। কে যেন বলে উঠলেন—'শালা! বেইমান!' আমি ইনি কে? (এখন বলি ওটা ছিলো অ্যারেঞ্জড) মোক্ষম —'কী খাচ্ছেন জানেন? বীফ-স্টেক! আপনারা জানেন ইনি সাত্ত্বিক! গরুর রানের মাংস কিমা করে এত্ত বড় বড় করে বানানো হয়—তারপর খাঁটি মাখনে ভেজে···' মহিলারা নাকে কাপড় দিলে···

স্লোগান উল্টা···'গরু খেকো হিন্দু নিপাত যাক/পদ্ম এবার শুকিয়ে যাবে।' আমি পা বাড়ালাম যাবার জন্য। দেখলাম আমাদের বুদ্ধিজীবী কয়েকটা চ্যাংড়া গিয়ে কয়েকজন বুড়োর সঙ্গে কথা বলছে কানে এলো কথাগুলো। 'আজিজুল হক কিন্তু ভোট বয়কটপন্থী··· পুলিস আসবে···বেশি আসতে দিও না···'

একটু 'ডিপ্রেস্ড' হয়ে গেলাম। এঁরা কি সত্যি সত্যি বি. জে. পি-কে লড়তে চায়? এঁরা কারা?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এবং সেকাল

জান বাঁচানোর জন্য সব ফরজ/ফরজ

খাদ্য-খাদক প্রশ্নে মনে পড়লো দেশে যখন নকশালবাড়ির যুগ সেই সময়কার একটা ঘটনা। ক'দিন পরেই তো সেই অভ্যুত্থানের পঁচিশ বছর পূর্তি হতে চলেছে।

আমি তখন সুন্দরবন অঞ্চলে কাজ করছি। ওখানে যাঁরা গেছেন তাঁরা জানেন। প্রত্যেকটা গ্রাম ছোট ছোট নদী বা খাঁড়ির পারে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটা গ্রামেই তিনদিকে এই রকম ছোট বড় নদী। কোন একটা নদীর একপারে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা অন্য একটি নদীর পারে থাকেন (এঁরা বলেন 'বুনো') আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক। একই গ্রামে কিন্তু পৃথক পৃথক পাড়া। আমার কাজের গ্রামের মধ্যেও তাই। যদিও আমি দু'টো সম্প্রদায়ের মাঝেই কাজ করি—ভিতটা কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যেই।

ঠিক নদীটার ওপারেই কয়েকশ বিঘের লাট পেরিয়ে ইছামতীর শাখার ধারে মুসলমানদের গ্রাম। ওই লাটের মালিক 'বাংলা সংস্কৃতি'র পুরোধা ঠাকুর পরিবার চালান নায়েবী শাসন। একজন নায়েব সব দেখাশোনা করেন। আমাদের গ্রামে কৃষক আন্দোলন জোরদার হতে হতে একেবারে তুঙ্গে। সুদখোর, মহাজন আর জোতদাররা পালাতে শুরু করেছে। মুসলমান গ্রামের ভিটাতে আমরা বিস্তার ঘটাইনি। সেটা ইচ্ছে করেই ফেলে রাখা হয়েছে। সব গ্রাম এক সঙ্গে তাতিয়ে লাভ নেই।

একদিন দুপুরে এলাকার পার্টি সম্পাদক, কজেন মুসলমানকে (৫ জন) নিয়ে আমার 'শেলটারে' হাজির। ওপারের মুসলমান চাষী। বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। ক'দিন 'নায়েবে'র অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাষীরা নদী পেরিয়ে এসে অভিযোগ করছিলেন। ওঁদের ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, কোন রকম সংগঠনই ওদিকাতে নেই।

ঘটনার গুরুত্ব কতখানি বোঝার চেষ্টা করতে করতেই শুনছিলাম ঘটনাটা।

সেদিন সকালে নায়েবের অত্যাচার একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যায়। ভোরবেলা একজন অবিবাহিতা নদীর ধারে প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলে তাকে ধরে নিয়ে যায় নায়েব। সেও সেই সময় পাশের ঝোপে বসেছিলো একই কাজে। প্রশ্ন করলাম—'মেয়েদের দিকে ও গেল কেন?'

'কি যে বলেন কমরেড, নায়েব জমিদাররা 'কেন'র ধার ধারে না কি?' লজ্জা পেলাম নিজের অজ্ঞতার জন্য। ও প্রতিদিনই ওখানটাতে বসে বসে না কি এর আগেও দেখতো!

গ্রামে হৈ হৈ পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সর্বস্বান্ত মেয়েটা ফিরে আসে। এই 'মুনীষ' পাঁচজন ওর জমিতে খাটে। সেদিনও গেছে মাথা ঠাণ্ডা রেখে। এ পারের আমাদের একজন আদিবাসীও সেখান খাটেন। কোদাল চালাতে চালাতেই সব কথা হয়। এ পাড়ের কৃষকটা বলেন দে, না শালাকে খতম করে! ঐ তো শালা বেচাইন—তামাক খাচ্ছে!' চোখে চোখে কথা। কোদাল কোপাতে কোপাতে ওরা নায়েবের কাছে চলে আসে। ঘাড় হেঁট। কোদাল পড়ছে মাটিতে, চোখ নায়েবের উপর।...কোদালের দূরত্বে নরপশুটা! এবার ছ'টা কোদাল ওপরে উঠলো, কিন্তু সব কটা মাটিতে পড়লো না, একটা পড়লো নায়েবের মাথায়। এত কু-বুদ্ধি যখন মাথার ভেতর। এই মাথাতে ফসল ফলাতে চায় একজন। সোনা ফললেও ফলতে পারে।

ব্যস! তারপর এখানে এঁরা, আর ওখানে বি-এস-এফ ক্যাম্পের লোকেরা! সব শুনে একটু মুশকিলেই পড়লাম। ওঁদের শাবাশ দিলাম। কিন্তু ভাবছি কী করবো এদের নিয়ে। এঁদের 'হিন্দু'দের বাড়িতে রাখা যাবে না। ওখানে ক্যাম্পের লোকেরা মাঝে মধ্যেই আসে। রাখতে গেলে রাখতে হবে আদিবাসীদের মধ্যেই। কিন্তু আদিবাসীরা যে...।

যা হবার হবে। পার্টি কমিটির সম্পাদককে বললাম 'অমুক, অমুক বাড়িতে দু'জন আর তিনজন করে ভাগ করে এঁদের ফিট্ করে দে! দিনের বেলায় না বেরোয় যেন।'

সে ওঁদের নিয়ে যেতে চাইলো। 'চাচা'রা থতমত খাচ্ছেন। এতক্ষণে বুঝতে পারছেন কী করেছেন তাঁরা। আমার দিকে তাকাচ্ছেন বার বার। সম্পাদককে বললাম 'শোন! সিধে তুলে দিস। এঁরা নিজেরাই ফুটিয়ে খাবেন।' চাচাদের মুখে হাসি ফুটলো।

এলাকা ছেড়ে দু-মাসের জন্য চলে গেছি অন্য থানাতে। সংগঠিত করার কাজে। সংগ্রামকে ছড়িয়ে দেবার কাজে। চাচাদের কথা মনেও নেই। দু'মাস পরে গ্রামে ঢোকার মুখেই মনে পড়লো চাচাদের কথা। ওখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন এখানকার লোক। এসকর্ট পার্টি। যাঁরা এনেছিলেন বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম 'সেই মুসলমান চাষীদের খবর কি?' সম্পাদক বললেন—'চল না! দেখবি!'

'ঢুকলাম আদিবাসী পাড়ার একটা বাড়িতে। একটা আঙিনায় আবছা চাঁদের আলোয় শ্যাওড়া গাছের নিচে খেজুর পাতায় তেলাই (মাদুর) বিছিয়ে আসর জমেছে। পাশে হাঁড়ি। সামনে কলাই ওঠা থালাতে মাংস, হাঁড়িতে কী আছে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। পচুই। আর। আট আটটা ডাল-ভাঙা-মাইল হাঁটার পর হাঁড়িয়ার হাতছানি উপেক্ষা করার মত বিপ্লবী খুব কমই দেখা যায়, আমি তো কোন ছার!

জামা কাপড় না ছেড়েই গিয়ে বসলাম। সাদর অভ্যর্থনা! ভাবখানা—'এসো বাওয়া! ঘরের ছেলে ঘরে এসো!'

বসেই চমকে উঠলাম! 'আমার চাচারা! এখানে এই আসরে! শুয়োর-পচুই-এর আসরে!' খাবো কি! হাতের বাটি হাতেই ধরা। আমি হাঁ করে ওদের দেখছি! একি অসাধ্য সাধন করেছি, আমি আমরা। আমাদের নকশালবাড়ি। সকলের দাড়ি গোঁফ চাঁচা মোছা! একেই মুসলমান! তাতে গাঁয়ের মুসলমান। শুয়োর! আমাকে ওরকম ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওঁরা লজ্জা পেলেন। একজন নার্ভাস হয়ে জোরে বলে উঠলেন (হয়তো হাঁড়ির এফেক্ট)—"মোদের হাদিছে আছে, 'জান বাঁচানোর জন্য

সব-ই ফরজ'।"

আমিও তাড়াতাড়ি বললাম 'মুইও পড়েছি সে কথা। বলো সবাই জান বাঁচানোর জন্য সবই ফরজ! বাকিরা চিৎকার করে উঠল—'সবই ফরজ। সব-ই ফরজ!'

তারপর কি চললো। মাঝে নাইট গার্ডের পাহারাদাররা একবার এসে ধমকে গেলেন—'এই কমরেডরা! কি হল্লা মাচিয়েছিস! সেই বড়গাঙের ধার থেকে শুনা যাছে। একটু আস্তে…

সম্পাদক সমীপে—পাভলভের কুকুর

এটা ছিলো সে কাল। যখন আমাদের নেতা বলতেন—'কোনো প্রলোভন দিয়ে কাউকে দলে টেনো না। কৃষককে বলবে বিপ্লব হ'লেই তুমি যে দুধে ভাতে থাকবে এমনটা ভেবো না। তোমার দায়িত্ব বেড়ে যাবে অনেক। বিপ্লবকে রক্ষা করার দায়িত্ব! নতুন শিশুটাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব। সে বড় কঠিন কাজ। গর্ভ যন্ত্রণা থেকে একটা ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার কাজ অনেক বেশি কষ্টকর।'

তাই বিপ্লব মানে কেবলমাত্র বস্তুগত লাভ নয়। বিপ্লব মানে আমূল পরিবর্তন। কী ব্যক্তির! কী সমাজের। নতুন জীবনধারা। একটা সংস্কৃতি! জিন্দাবাদ 'আমার ফেলে আসা চাচারা!'

থানার ও সি র চেয়ারে বসে ও সিকে ধমক দিতে পারা যাবে, ভি সি র সঙ্গে একই চেয়ারে বসে তড়পানো যাবে—এ-সব বাহ্যিক শর্ত দিয়ে সংগঠন বাড়াতে গেলে কি হয় দেখছেন তো ত্রিপুরায়? এখন আর্জি 'সর্বস্বতা?' ধমক খাওয়া ও-সিগুলো লাঠি ঘুরুচ্ছে?

নিওন লাইটে আমার বউ ঠকেছিলো সত্যি কিন্তু দোকানদার তার একটা স্থায়ী খদ্দের হারালো!

প্রলোভনে ক্যাডার তৈরি করলে ক্যাডারের অবস্থা হয় সেই পাভলভের কুকুরের অবস্থা—

'মাংস দাও আলো জ্বালাও—স্যালাইভা ঝরবে, একবার দাও, দুইবার দাও, বারবার দাও। ব্যস! এবার দশবারের বার মাংস বন্ধ করে শুধু আলো জ্বালাও—প্রথম বার ঠিকই লালা ঝরবে এবং

একই পরিমাণে। দ্বিতীয়বার মাংসহীন আলোতে একটু কমবে। তৃতীয়বার আর একটু। কয়েকবার পরে দেখা যাবে একেবারে শূন্য। আলো জ্বাললেও কুকুরটা আর সাড়া দিচ্ছে না। আলোর সঙ্গে পেতে অভ্যস্ত কুকুরটার মস্তিষ্কে 'ইনহিবিশান', শুরু হয়— না পেলে তার রেসপন্স কমে যায়। সে ল্যাজ নাড়ে কিন্তু নড়ে না।

উজ্জ্বলা অমৃত কি শেষ বিচারে জিতেছে? হ্যাঁ, ব্ল্যাক মেইলিং-এর ভয়ে সে যদিও জবরদস্ত মহিলা কমরেড—হয়তো ক্যান্ডিডেটও হয়ে যাবে—কিন্তু মাঝে মধ্যেই আমার মত কেউ গিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়ে আসবে কয়েকদিনের জন্য! মিথ্যা দিয়ে কোন কিছু পেলে সেটা ধরে রাখার জন্য সারাজীবনই মিথ্যাচার করে যেতে হয়—আর এটা অসম্ভব ব্যাপার।

কমরেড অনিল সেদিন এলাকার লোকদের বোঝাতে পারলেন। কিচ্ছু পাবেন না, কিচ্ছু দিতে পারবো না আমরা—শুধু মাথায় রাখুন আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বিপন্ন, বিপন্ন মনুষ্য প্রজাতির ভবিষ্যৎ, সেই দিনই অনেক কর্মী পেয়ে গেলেন।

মানুষের দুর্বল জায়গাতে ঘা মেরে তাকে সাময়িক শর্তাধীন করে নিজের পক্ষে আনা যায়–কিন্তু কোন মানুষই তো আর চিরকাল দুর্বল থাকেন না। দুর্বল জায়গা সবল হয়। বাইরের শর্ত অকেজো হয়ে যায়—ঘটে কেরালা। তাই না রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে 'হিন্দুত্ব' রাজত্ব করা সত্ত্বেও কমে গেল ভোটটা। হাত ছাড়া হলো দু-নম্বর কলোনি।

হিটলারের সন্ত্রাস, প্রথমদিকে জার্মান খিস্টানদের জাতি হিসাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেও কেন পারলো না টিকে থাকতে? সেই ঘুরে ফিরে পাভলভের কুকুর! ভেতরটাতে দুর্বলতা কেটে যেতেই বাইরের শর্ত হয়ে গেল অকেজো—তা ছাড়া একটা জাতির বিপন্নতা বোধ থেকে সন্ত্রাস সৃষ্টি সমগ্র মানব প্রজাতিকেই করে তুলেছিলো বিপন্ন। তাই শেষ হাসিটা স্তালিনই হাসলেন! সোভিয়েত মানুষের বিপন্নতার সঙ্গে বিশ্বমানবের বোধ একাত্ম হয়ে গেল। দলে দলে তানিয়ারা বুকে মাইন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লো হিটলারের সাঁজোয়া গাড়ির তলায়। ওদিকে মুসোলিনির রথের

চাকা গেল বসে।

প্রিয় সম্পাদক, এখন সিদ্ধান্ত নেবার বা রায় দেবার ভার আপনার। গণহিস্টিরিয়া সৃষ্টি করে দঙ্গল দঙ্গল লোক পাওয়া যায়, প্রলোভনও লোক ডেকে আনে, আবার একটু একটু করে এক একজনকে ডেকে আনা যায়। একটা ঘটনার সাক্ষী তো আপনি-আমি দু-জনেই ভাবছিলাম বলবো না—'নিউজ প্রিণ্টের' কোটার যখন কয়েকটা পাতা বাকি আছেই বলে ফেলি—পরবর্তী-কালের এক নকশালপন্থী নেতাকে কি করে 'বিমানবাবুদের' হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম মনে আছে আপনার! আন্দোলনের সাহায্যের জন্য। (মানে মারপিট ইত্যাদি) তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন আমাদের সঙ্গে, মানে পার্টি থেকে বহিষ্কৃতদের সঙ্গে, অন্যদিকে প্রার্থী সভ্যপদ (ক্যান্ডিডেট মেম্বারশিপ) নিয়মিত করার জন্য আলোচনা চালাচ্ছেন। বিমানবাবুদের সঙ্গে খুব ঝামেলায় পড়েছিলাম ওনাকে নিয়ে।

ওদিকে উত্তরবঙ্গের কমরেডরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটা জাঠা নিয়ে পাকারাস্তা না মাড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে কলকাতায় আসবেন—ভিয়েতনামের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য। এতে কৃষকদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে, বিপ্লবে কৃষকদের ভূমিকাটাও ফুটে উঠবে। ওঁদের সঙ্গে থাকবেন তরুণ কবি, নাটকের দল, গানের দল····। একে উত্তরবঙ্গ তায় ভিয়েতনামে। কে আর এই দুটো নাম থেকে তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইতেন? আমাদের এই পরবর্তীতে হনেওয়ালা-নেতাটির একটি দুবলতা আমরা জানতাম, আর জানতাম বিমানদাদের গোঁড়ামী এবং ছুঁত্‌মার্গিতা। উত্তরবঙ্গের 'হাঁটা'কে কলকাতাতে সংবর্ধনা জানানোর জন্য একটা কমিটি করা হলো। সেই কমিটির নামে বিলি করা হলো একটা প্রচারপত্র। তার প্রেস লাইনে লিখে দেওয়া হলো 'প্রচার' সম্পাদক ··কর্তৃক····থেকে প্রকাশিত এবং প্রচারিত।

ব্যস! আমাদের দেখিয়ে দরকষাকষির সব সুযোগ রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল তাঁর সামনে। আমার কাছে অভিযোগ জানাতে এলেন। নির্বিকারভাবে বললাম, 'কাগজে বিবৃতি দিয়ে অস্বীকার

করো না। জানিয়ে দাও উত্তরবঙ্গ এবং ভিয়েতনাম 'হাঁটা'র সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। সে ঝুঁকি উনি নেবেন না জানতাম। চরম বিরোধী হয়ে উঠলেন—'অফিসিয়াল পার্টি'র। ভীষণ জঙ্গী। হ্যাঁ, আমরা তাঁকে পেলাম। কিন্তু কি লাভ হ'লো? পেলাম ডবল করে হারাবার জন্য? তাই না?

আপনার ঘাড়েই বোঝা চাপালাম—কি রকম কর্মী আপনি বেছে নেবেন? হাজার হাজার পাভলভের কুকুর যারা মাংসের লোভে আলোতে সাড়া দেবেন। অবশ্যই পাঠকরা কুকুর শব্দটাকে গালাগালি অর্থে নেবেন না। মানুষ এরকম নয়। নয় বলেই উজ্জ্বলারা ফিরে আসে। কাঁদে! লোভের খাঁচায় শর্তাধীন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। ওটা ব্যবহার করেছি কথার কথায়। নাকি সত্যিকারের বেয়ার ট্রুথের প্রতীক যে আলো, সেই আলোক-প্রেমী একশ'টা মানুষ। তাঁরা মাংস পেলে খুশি হবেন। না পেলে নিস্তেজ হবেন না। আলো দেখলেই সাড়া দেবেন।

জানি আপনি জি-বি-এস-পন্থী! শ'র মতনই প্রশ্ন তাগছেন আমার বিরুদ্ধে—'তা আজিজুলদা, দেড় বছরে তো কুল্লে বই বিক্রি হয়েছে আটশ'। সেই একই কথা তো আমরা বলছি। দেখুন আমাদের বই আর কাগজ মুখ্যমন্ত্রীর টেবিল থেকে শ্রমিকের কাজের টেবিলে। এত 'র'-মাল লোকে খায় না। তাই আমরা একটু জল মিশিয়ে দিই। লোকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দেয়। তারপর হঠাৎ 'সাডেন কিক'। খেতে গেলেই যদি বুক জ্বালা করে, নাকের জলে হতে হয়—কে ছোঁবে বলুন আপনার মাল?" …মাথা নিচু করে ফিরে যাব রাস্তায়। কিন্তু ভাবতে থাকবো … 'সাডেন্ কিক,, 'ব্লিৎসক্রীগ' 'ল্যান্ড-স্লাইড ভিক্টরি', 'সুইপ' আর গোয়েবল্‌স্ মুক্ত—পৃথিবী!

[আবার ভেঙে পড়লো জেলের দেওয়াল…মুক্ত কয়েকজন মানুষ !]

শুরুর জন্যে শেষ

সংবাদ-পত্রের অফিসে বসেই খবরটা পেলাম সংবাদ-পত্রে কোন এক মোঘল সম্রাটের স্বপক্ষে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য সত্যকে তার মেসের লোকেরা প্রচণ্ড মারধোর করে এবং তার জামা কাপড় বই-পত্র টেনে হিঁচড়ে বাইরে করে দেয়। সে এখন এন. আর. এসের সার্জিকাল ব্লকের 'ইউ' ওয়ার্ডের একটা কেবিনে ভর্তি। ভাববার চেষ্টা করলাম কী এমন লিখেছে সত্য? এই কাগজটার যে সাংবাদিক সত্যর সঙ্গে দেখা করেছে তাকেই পাকড়াও করলাম।…

সে কাগজটা বার করে দিল, একটা ইংরেজি দৈনিকের রবিবারের তিনটে পাতা জুড়ে লেখা। হেডিং… "সত্য ঘটনাগুলো অবশ্যই বলতে হবে…" ইতিহাস কংগ্রেসের জন্য লেখা একটা নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার এটা। লেখক প্রথমেই আমাদের পণ্ডিতদের ইতিহাস চেতনাকে ব্যঙ্গ করেছেন। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের চোখে নিজেদের ইতিহাস দেখতে গিয়ে তাদের মতই আমরা সাদাকে কালো করে দেখতে অভ্যস্ত। তাদের মতই ভাবতে চায়—ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মের দ্বারা বিভাজিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস —এই ধর্মরক্ষার ইতিহাস। এরই জন্য মোঘলযুগের সবচেয়ে দক্ষ, নির্লোভ শাসকটা তাদের চোখে নিষ্ঠুর। কারণ তাদের লালসা সর্বগ্রাসী—নির্লোভ একজন ভারতীয়কে চিত্রিত করা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর।…

তারপর সে দেখিয়েছে এই বাদশা আলমগীরের আমলের বিভিন্ন ঘটনাবলিকে কী রকম বিকৃত করা হয়েছে। প্রচুর তথ্যের ছবি দিয়ে প্রমাণ করেছে আলমগীর তাঁর রাজত্বের সময়ে রাজ-কোষের খরচে অন্তত পক্ষে আটখানা হিন্দু মঠ গড়েছিলেন। পার্শিতে লেখা রাজকোষের নথি থেকে এর প্রমাণ মেলে। এই

সমস্ত মঠগুলোতে কোথাও ৬০০, কোথাও ৮০০ পণ্ডিত এবং শিষ্যরা থাকতেন। সুবে বাঙলার ভক্তিবাদীরা যখন বিপন্ন অস্তিত্ব হয়ে পড়েন আওরঙ্গজেব তাঁদের সব রকমের সাহায্যে করেন। দুর্দশাগ্রস্ত এই সমস্ত মানুষগুলোকে তিনি কিন্তু মুসলমান করেননি, তাঁর প্রমাণ আজও গৌড়ীয় বাংলাতে আছে। সেই সবের ধ্বংসাবশেষের চিত্রও আছে নিবন্ধে।

এর পরেই লেখক চলে এসেছেন মন্দির ধ্বংসের প্রসঙ্গে, সরাসরি আক্রমণ করেছেন মিথ্যা-যুক্তিগুলোকে। এই সমস্ত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা বার বার বলেছেন, আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। কোরাণের সর্বময় কর্তৃত্বের বাইরে তিনি কিছুই মানতেন না। অথচ এরা অযত্নে যেটা এড়িয়ে গেছেন তা হল কোরাণে পরিষ্কার লেখা আছে মসজিদ গড়ে তোলার জন্য চাই হালাল (ন্যায় পথে) রোজগারের পয়সাতে খরিদ করা জমি। স্বেচ্ছাদানের এবং স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে একে…। (বয়েত ১৮শ পারা, আল কোরাণ) না হলে সেই এবাদত (প্রার্থনা) গ্রাহ্য হবে না (ঐ)। "তাহলে নিবন্ধকার প্রশ্ন রেখেছেন… "হয় আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এটা ভুল, না হয় মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছেন এটা ভুল! এবং অপপ্রচার…।" তাহলে মন্দির ভাঙার ঘটনা কি মিথ্যা। নিবন্ধকার বলেছেন, 'একশ' ভাগ সত্যি। আর মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশী মন্দির যার হাতে ধ্বংস হয়েছিল সেই কালাপাহাড়টার নাম পৃথ্বীরাজ চৌহান…ছ'শ কয়েকটা যেন। মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার কেন আক্রান্ত হয় রাজশক্তির হাতে? ইন্দিরা গান্ধী কি শিখ বিদ্বেষী ছিলেন? স্বর্ণমন্দির কেন ধ্বংস হল? মনিপুর, মিজোরামে শিখ রেজিমেন্ট কম করে যে এক ডজন গির্জা ধ্বংস করেছে সেটা কি তাদের খ্রীস্ট ধর্ম বিদ্বেষ? আসল কথা হল এই সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চিরকালই রাজশক্তির আনুকূল্যে গড়ে ওঠে, এবং অর্থনৈতিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়।…

তাই যে-কোন সম্রাটই নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্তের আঁতুড় ঘরটাকেই গুঁড়িয়ে দিতেন। আওরঙ্গজেবও

তার ব্যতিক্রম নন। মসজিদে যে হিন্দু স্থাপত্য দেখা যায় সে সম্পর্কে নিবন্ধকার জৌনপুরি শিল্প স্থাপত্যের আশ্রয় নিয়েছেন।

সবচেয়ে বেশী আক্রমণাত্মক হয়েছেন জিজিয়া কর প্রসঙ্গে, লেখক খুব সরাসরি প্রশ্ন রেখেছেন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে হজযাত্রীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ভ্রমণ কর, প্রমোদ কর নেওয়া হয় সেটা কী? এর পরিমাণ জিজিয়া করের ৮ গুণ বেশী।...

প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে ইতিহাসের অনেক তথ্য দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠিক করলাম আজই হাসপাতালে গিয়ে সত্যকে অভিনন্দন জানিয়ে আসতে হবে...

বেরিয়ে পড়লাম...। মনে মনে বললাম, 'উজ্জ্বলা, তুমি কী হারিয়েছ তুমি জানো না! একটা মানুষ পশুদের হাতে আক্রান্ত..."

দুই

এন. আর. এসের সার্জিকাল ওয়ার্ডের, দেড়তলার ঘুপচি কেবিনটার সামনে যখন পৌঁছালাম...দেখি অনেকেই এসে জমেছে, প্রভাত আছে, অসুস্থ উদয় এসেছে...সুস্মিতা আছে, তার চোখ লাল...অঝোরে কাঁদছে। শুধু নেই তপতী...আর আমাদের অধ্যাপক বন্ধু। আমাকে দেখে ওরা শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল, প্রভাত বললে ঘুমুচ্ছে, একটু আগে সিডেটিভ দেওয়া হয়েছে..." পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম..., এ কী চমক?

পেছন থেকে দেখে মনে হল উজ্জ্বলা! একটা টুলের ওপর বসে ঝুঁকে আছে সত্যর মুখের ওপর। ঘুমের ঘোরে সত্য কী বলছে? নিশ্চিত হবার জন্য ডাকলাম "উজ্জ্বলা, তুমি?"

ডাক শুনে চমকে উঠলো চেয়ারে বসা মহিলা, কপড়টা ঠিক করে উঠে দাঁড়ালো, হ্যাঁ উজ্জ্বলাই! 'তুমি এসেছ আজিজদা? বসো?' টুলটা ছেড়ে ও গিয়ে সত্যের পায়ের দিকে বসে। ম্লান মুখ, বিজয়িনীর হাঁসি ঠোঁটে 'তাহলে সত্য আর উজ্জ্বলাতেও মেলে কখনও কখনও বলো?' এবার লজ্জা পাবার পালা আমার।

সত্যর দিকে তাকালাম, ড্রিপ চলছে এক হাতে, রক্ত অন্যটাতে। মাথায় ব্যান্ডেজ। চাদরটা টেনে উজ্জ্বলা দেখাল পাঁজরেও ব্যান্ডেজ

…প্রশ্ন করলাম, 'কী ব্যাপার বল তো ?'

কিছু জানি না, ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকেই বার বার মনে হচ্ছিল সত্য বিপদের মুখে ··পাগলের মত খুঁজতে শুরু করলাম ওকে। তুমি তো ঠিকানা দিয়ে আসো নি ··। এখান থেকে সেখানে ঘুরে শেষে ইতিহাস সংসদের অফিস থেকে ওর মেসের ঠিকানাটা পাই···। কাল দুপুরে ঐ রাস্তাটা ধরে বাড়িটার নম্বর খুঁজতে খুঁজতে এগুচ্ছি হঠাৎ মনে হল উল্টো দিকে কয়েকজন লোক একজনকে লাঠি, রড নিয়ে পেটাচ্ছে···লোকটা কী যেন বলছে। ছুটতে শুরু করলাম···রাস্তার মাঝামাঝি এসে শুনতে পেলাম, একটা কাগজ হাতে তুলে ধরে লোকটা চেঁচাচ্ছে ··'এর একটা কথাও মিথ্যা হলে আমি আপনাদের ৫০ হাজার টাকা দোবো···' আর চিনতে অসুবিধা হল না, 'সত্য আমি, আমি, আমি উজ্জ্বলা আসছি···এই জানোয়ারের বাচ্চারা কার গায়ে হাত তুলছিস ! ·· কাছাকাছি আসার আগেই দেখলাম একটা রড্ উপরে উঠলো···' জানোয়ারের বাচ্চারা ছুটে পালিয়েছে।'

ছুটে গিয়ে ফুটি ফাটা সত্যর মাথাটা তুলে ধরলাম। এক রিকশাওলাকে পেলাম, দু-জনে ধরা ধরি করে তুললাম রিকশায়। সত্য দেখেনি···আমি এসেছি···কোনরকমে এখানে···'

পর্দা ফাঁক করে সুস্মিতা জিজ্ঞাসা করলো—'উজ্জ্বলা, হুঁশ ফিরেছে !' উত্তর দিলাম আমি। 'না, তোমরা এসো।' ওরা একে একে ভেতরে আসে।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথম মুখ খুলে মুখরা সুস্মিতা, 'এ শালা পদ্মের বংশ ধ্বংস করবো আমি !' ওর দিকে তাকালাম, 'পাঁকেই ওদের জন্ম তো !'—প্রভাত বললো, উদয়, হাত মুঠো করছে, খুলছে। 'সত্যদা, যদি এ যাত্রা বেঁচে যায়, ঐ মেস ওখান থেকে ওঠাবোই ··'

আমি হাঁসি, সচেতন সত্য চোখ মেলে। একটু জোরে বলি··· 'হ্যাটস অফ টু রথ অ্যাণ্ড পদ্ম ! আবার একটা ২৮শে ফেব্রুয়ারি —৭৬ সাল ঘটলো···অদৃশ্য পাঁচিলটা খুঁড়তে হবে না ? জেল থেকে মুক্তি পেতে হবে না ? রাত জাগতে হবে না ? যাও একে একে খেয়ে এসো। পালা করে আমরা রাত জাগবো···পাঁচিল

খুঁড়বো…আবার 'একটা অদ্ভুত জেল ভাঙবো…যাও একে একে খেয়ে এসো…আমি ডাঃ মনোজিত দাসের কাছে যাচ্ছি…উজ্জ্বলা তুমি থাকো…'

সেই ২৮শে ফেব্রুয়ারির (ঐতিহাসিক প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙা…কারাগারে আঠার বছর ১ম পর্ব…) সেনাদল যেন কমাণ্ড শুনলেন…মাথা নীচু করে একে একে চলে গেলেন একটুও বিশৃংখলা নেই…। তাদের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বলাকে বললাম, 'এবার তুমি যাও—ঐ লেডিজ হস্টেলে ডাঃ রমা সরকারকে বলবে…' সে আপত্তি করে…। ধমক দিয়ে বলি, 'যাও বলছি, ওখানে চানটান করে ঘুমাবে…শেষ রাতে তোমার ডিউটি…' আমি এখানে বসছি…।

'তুমি ? তুমি খাবে না ?…'

'কমাণ্ডারের সব থেকে শেষে…' ম্লান হাসি হেসে উজ্জ্বলা পা বাড়ায়…। সত্য কী যেন বলছে। তাকিয়ে থাকি ওর মুখের দিকে… আমার চোখের সামনে গলে যাচ্ছে লালসার পাঁচিল । মস্কোতে লেনিন-স্তালিনের ছবি নিয়ে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল… জানোয়ারটা রক্তাক্ত নখ ঢুকিয়ে নিচ্ছে নিজের থাবা মধ্যে…

শুরুর শেষ

বৃদ্ধ দার্শনিক কোর্টের ডকে দাঁড়িয়ে বলে চলেছেন…'শোন নাগরিকগণ, তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করেছ, মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করেছ আমার বিরুদ্ধে। সেই মৃত্যুকে আমি বরণ করবো —এটা প্রমাণ করার জন্যই করব যে মানুষ অমর। মৃত্যুকে আমি ঘৃণা করি। আর আর মানুষ যাকে ঘৃণা করে তাকে ভয় পায় না। তোমরা আমাকে পশু বানাতে চেয়েছিলে, পারোনি সেটাই আমার অপরাধ। আমি যা নই সেটা হবার ভণ্ডামি করিনি বলেই আমি নিন্দিত।

আমি তোমাদের তিরস্কার করেছি…দংশক মক্ষিকার মত তোমাদের বিরক্ত করেছি…তোমরা হৈ চৈ করেছ…আমার কিছুটা নাম ছড়িয়ে গেছে…সম্মানও বেড়ে গেছে…এটাই হয়েছে সমস্যা…।

হোমার বলেছেন, মানুষ তো কাঠ, পাথর থেকে জন্মায়নি…

তাই আমারও পুত্র-কন্যা আছে। আমি তাদের তোমাদের দরবারে হাজির করতে পারতাম। তোমরা দেখতে পেতে লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য আর অবহেলার চিহ্ন। দেখতে পেতে পশুদের আক্রমণে পদদলিত আত্মা—মনুষ্যত্ব। না, আমি সেটা করবো না। কারণ—আমার একটা সম্মান আছে, মনুষ্যত্বের একটা সম্মান আছে…।'

শ্রোতাদের চোখে জল আসে, চোখের জলে ভারী হয়ে যাওয়া কতগুলো কণ্ঠস্বর চিৎকার করে—"বৃদ্ধ, তুমি ক্ষমা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকো! আমরা তোমাকে চাই…"

বৃদ্ধ—'না, আমি ক্ষমা ভিক্ষা করবো না। শুধু তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ, যদি কোনদিন আমাদের সন্তান-সন্ততিরা, তারা যা-নয়, তাই হবার ভাব করে তাদের তিরস্কার করো, যদি তারা অযোগ্য হয়েও মনুষ্যত্বের সম্মান দাবী করে…ভর্ৎসনা কোরো…যদি তারা অক্ষম হয়েও…শৌর্য দেখাবার চেষ্টা করে…নির্বাসিত কোরো যদি তারা অপদার্থ হয়েও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়…ক্ষমা কোরো…।"

[উত্তেজিত বধ্যভূমি, কেঁপে ওঠে বিচারকের আসন। নাগরিকদের চিৎকার…]

নাগরিকগণ :—বৃদ্ধ, তুমি ফিরে এসো!…

[টি-ভি'র পর্দাতে…পড়ে থাকতে দেখা যায় এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ…ভাষ্যকারের মন্তব্য…]

"…সেসেস্কুকে বিদ্রোহী সেনারা গ্রেপ্তার করে এবং বিচারে তার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হয়…টি-ভি-তে প্রভু যীশুর নামে জয়ধ্বনি ওঠে…! চার্চের প্রাচীন পুরোহিত ফারমান দেয়…যীশু মঙ্গলময়…সেসেস্কু মৃত! হায়নারা রাস্তায়…